ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা-৭

প্রকাশক
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা-৭

মুদ্রক
তুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশন্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৩ ডি মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
তরুণ দাস

পরম স্নেহাস্পদ
শ্রীমতী রত্নাকে
দিলাম

ভূমিকা

রবীন্দ্র-প্রতিভার অভিব্যক্তি নানা বিচিত্র পথে। বর্ণালীর মতই তার বর্ণাঢ্যতা। তার কয়েকটি দিককে বিষয় করে এই প্রবন্ধগুচ্ছ রচিত হয়েছে। যে দিক বড় করে দেখানো হয়েছে তা তাঁর সাধনজীবন এবং ভারতীয় ভাবধারার ধারক এবং বাহক হিসাবে বিশ্বের নানা জাতির কাছে তাঁর দৌত্যের ভূমিকা। ভারতীয় ভাবধারার ধারক হিসাবে তাঁর সাধনজীবনের সঙ্গে তাঁর দৌত্যের কাজ অঙ্গাঙ্গীরূপে জড়িত। এই কারণে একটি মূলপ্রবন্ধের নামে গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ'।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই পুস্তকখানির দ্রুত প্রকাশনের ভার নেওয়ায় আমি বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেছি, কারণ এই অনন্যসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ হল রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সহিত শিক্ষিত সমাজকে পরিচিত করা। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন সচিব পরম প্রীতিভাজন শ্রী রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

স্বীকৃতি

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে বরোদা প্রবাসকালে নাত-বউ তনুজা দেবীর স্বহস্তে প্রস্তুত সন্দেশ খেয়ে বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি সিঙ্গাপুরে গৃহীত একটি আলোকচিত্রের পার্শ্বস্থানে পত্রাকারে কবিতা লিখে তনুজা দেবীকে উপহার দেন। তনুজা দেবীর পরিচয়—ইনি রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর একমাত্র পুত্র সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী। বর্তমানে উক্ত আলোকচিত্রটি "ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদর্শশালায় শ্রীযুক্তা মমতা চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উপহার প্রদত্ত। বিশ্বভারতীর সৌজন্যে কবিতাটিসহ চিত্রটি 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা' বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

কল্যাণীয়া
তনু,

অন্তরে তব স্নিগ্ধ মাধুরী পুঞ্জিত,
বাহিরে প্রকাশ সুন্দর হাতে সন্দেশে।
লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গুঞ্জিত,
মুগ্ধ মধুপ মিষ্ট রসের গন্ধে সে।

Nakajima & Co'y
SINGAPORE

রবি দাদারে যে ভুলালে তোমার নাতিত্বে
প্রবাস বাসের অবকাশ ভরি আতিথ্যে;
সেই কথাটুকু গাঁথি দিল এই ছন্দে সে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ ফেব্রুয়ারি

ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ

ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' নামে কাব্য একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯০১ খৃষ্টাব্দে। তার আগে অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে সাহিত্যিক সমাজে তাঁর স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের কাব্যগ্রন্থ আগে প্রকাশিত হয় নি।

আগে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হতে 'নৈবেদ্য'র স্বাতন্ত্র্য সূচিত হয়েছে দুটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা। প্রথমত তার ভাষা গুরুত্বপূর্ণ, ছন্দের প্রতি আকর্ষণ এ গ্রন্থে শিথিল হয়ে এসেছে। ভাষার চাকচিক্য একেবারে বর্জিত হয়েছে। পয়ার ছন্দে প্রধানত চতুর্দশপদী কবিতার আকারে রচনাগুলি সজ্জিত। তুলনায় পূর্বে রচিত কবিতাগুলির ছন্দোবৈচিত্র্য ও শব্দচ্ছটা মনকে অভিভূত করে। তাদের বাহিরের রূপের উজ্জ্বলতা যেন চোখ ঝলসিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত রচনার বিষয়বস্তুর পরিবর্তন রীতিমত বিস্ময়কর। পূর্বে প্রকাশিত কাব্যগুলি সাধারণত কবির মনকে আকৃষ্ট করে এমন বিষয় নিয়ে রচিত কবিতায় সজ্জিত। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু তা ব্যতিক্রমই ; যেমন 'চিত্রা'য় 'জীবনদেবতা' শীর্ষক কবিতা। প্রধানত দুটি মূল সুর তাদের মধ্যে ধ্বনিত হয়। তারা হ'ল প্রেম ও প্রকৃতি। 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র প্রধান সুর প্রেম। অন্যগুলিতে প্রধান সুর প্রকৃতি। 'চৈতালি'তে প্রকৃতি প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে আছে। কোথাও সুর আরও হাল্কা হয়ে গেছে, যেমন 'ক্ষণিকা'য়। এমন কি হাল্কা কৌতুকও কোনো কোনো কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন 'সেকাল' কবিতায় কালিদাসের কালের 'বরাঙ্গনাদের' সঙ্গে বর্তমান কালের 'বিনোদিনীর' তুলনা।

এদের সঙ্গে তুলনায় 'নৈবেদ্য'এর বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এতদিন যেন কবির মন বাহিরে ছিল, এখন তা অন্তর্মুখী হয়েছে। সম্ভবত সেই কারণেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে ভাষা ভূষণ ত্যাগ ক'রেও গম্ভীর হয়েছে। এখানে বিষয় হল ঈশ্বর চিন্তা, প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধে মন্তব্য এবং ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের সশ্রদ্ধ ও গর্বিত আলোচনা। সবগুলিই গুরুত্বপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক বিষয় সম্পর্কিত। যেখানে ভারত হল কবিতার বিষয়বস্তু সেখানেও ভারতসংস্কৃতির আধ্যাত্মিক সম্পদেব প্রতি গভীর শ্রদ্ধার অনুভূতিই কবির প্রেরণা। অবশ্য পূর্বে রচিত কাব্যগ্রন্থগুলিতে আধ্যাত্মিক বিষয় একেবারেই আলোচিত হয় নি তা নয়। সেকালে কিন্তু তা ব্যতিক্রম, তা যেন অনুপ্রবেশ করেছে, ঠিক স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে 'কল্পনা'য় মায়াবাদের সমালোচনার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধরনের কবিতা যেন গ্রন্থগুলিতে হংসের দলে বকের মত সংকোচে স্থান ক'রে নিয়েছে। তারা শুধু এইটুকু নির্দেশ করে যে, আধ্যাত্মিক চিন্তা তখনও কবির মনকে জুড়ে বসে নি কবির মনের খিড়কির দরজায় মাঝে মাঝে উকি মারছে মাত্র। 'নৈবেদ্য'তেই আমরা প্রথম দেখি যে আধ্যাত্মিক চিন্তা প্রায় সমস্ত আসরখানি জুড়ে বসেছে।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় 'নৈবেদ্য'-এর মধ্যে ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে তা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সেই কারণে সে সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। তা যেন রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের আধ্যাত্মিক দূত হিসাবে ভূমিকার প্রস্তুতি পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

'নৈবেদ্য'-এ প্রকাশিত এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে একটি ভাব স্পষ্ট হয়ে পড়ে। তা হল প্রাচীন ভারতের মানসিক সম্পদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। সেকালের দার্শনিক উপলব্ধি, নৈতিক আদর্শ এবং

মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তিনি শুধু শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নি, ভারতবাসীর হয়ে তিনি গর্ববোধ করেছেন। সেই গর্ববোধ হতে সঞ্জাত একটি আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে ধীরে ধীরে প্রকট হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা হয়েছে যে ভারতের এই মানসিক সম্পদের কথা বিশ্ববাসীকে শোনাতে হবে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এক উপযুক্ত গুণ ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিনিধি চাই। সেদিন দুর্ভাগ্যক্রমে এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত কোনো প্রতিনিধিকে খুঁজে না পেয়ে তিনি হতাশ হয়েছিলেন।

আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে 'নৈবেদ্য'এর কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কবিতার বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

'নৈবেদ্য'-এর ৫৭ নং কবিতার প্রথম অংশ এই :

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবনতরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্বচরাচরে,
বনস্পতি, ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি।

উপনিষদের বিভিন্ন বচনে বিশ্বের সব কিছু ব্যাপ্ত ক'রে যে সত্তার অখণ্ড অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছে চুম্বকে তার মর্মকথা এখানে বর্ণিত হয়েছে। শুধু বর্ণিত হয় নি, এই উপলব্ধিকে তিনি কতখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এখানে পাই। অতিরিক্ত ভাবে আরও একটি জিনিস পাই। এই মূল্যবান দার্শনিক তত্ত্বটি যে ভারতেই প্রথম ঘোষিত হয়েছিল তার জন্য গভীর গর্ববোধও এর মধ্যে প্রকটিত। প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞার পরিচয় শুধু তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে নি, ভারতবাসী হিসাবে তাঁর হৃদয়ে গর্ববোধও ফুটিয়েছে।

৯৪নং কবিতায় পাই ভারতের নৈতিক আদর্শের প্রশস্তি। রাজা সেখানে নিস্পৃহ ভাবে প্রজার সেবা করেন। বীর সেখানে ধর্মযুদ্ধ

করতে যেমন তৎপর তেমন শত্রুকে ক্ষমা করবার মত উদারতা হৃদয়ে বহন করেন। কর্মী সেখানে কর্মফল সম্বন্ধে উদাসীন থেকে কর্তব্য সম্পাদন করেন। আর গৃহী সেখানে শুধু পরিবার পালন করেন না, প্রতিবেশী, বন্ধু, অতিথি এবং অনাথেরও অভাব মোচনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মোটামুটি এই আদর্শে সংযম, পরার্থ-সাধন এবং সামগ্রিক কল্যাণকর্মই ছিল জীবনের মূলমন্ত্র। এক সর্বব্যাপী সত্তার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি বোধ এমন ভাবেই মানুষের মনকে সেদিন অভিভূত করেছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সূচিত করতে তিনি বলেছেন :

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

তাঁর সবথেকে গর্বের বিষয় এই যে ভারতের ঋষি একদিন আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এমন চরম উপলব্ধি লাভ করেছিলেন যে বিশ্ববাসীকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলতে পেরেছিলেন যে অন্ধকারের পরে যে মহান সত্তা অবস্থান করেন তাঁকে তাঁরা উপলব্ধির করেছেন; 'জানামি এতং পুরুষং মহান্তম্'! চরম উপলব্ধির প্রত্যয় না ফুটে উঠলে এমন গর্বভরে কেউ কি বিশ্ববাসীকে সে উপলব্ধি কথা ঘোষণা করতে পারেন? কবির মন তাই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনমিত।

সে ছিল এক ভিন্ন কাল যখন ভারতবাসী আধ্যাত্মিক সম্পদে চরম সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তখন তাই ভারতের বাণী শোনাবার জন্য বিশ্ববাসী গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করত। তার তুলনায় এখন আমরা কোথায় আছি? তাঁর ভাষায় এখন আমরা আছি :

দীপহীন জীর্ণভিত্তি অবসাদপুরে
ভগ্নগৃহে, সহস্রের ভ্রুকুটির নিচে
কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে, সহস্রের পিছে

কবির তাই ঐকান্তিক ইচ্ছা জেগেছিল এই দুর্দিনের উপর যবনিকা টেনে আবার কি ভারতবাসী বিশ্বের কাছে ভারতের বাণী শোনাবার ভার নিতে পারে না? ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ ত এখনও ভারতেরই রয়ে গেছে। তাঁর মনের সেই আকূতি তাঁর কবিতার বাণী পেয়েছিল এই ভাষায়:

আবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে-মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্তা?

দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন তিনি ভারতের হয়ে বিশ্বকে ভারতের বাণী শোনাবার দায়িত্ব গ্রহণ করবার উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পান নি।—

২

তার পর প্রায় একযুগ পরে একটি নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন ভারতের হয়ে বিশ্ববাসীকে বাণী শোনাবার দায়িত্ব ঘটনাচক্রে তাঁরই ওপর এসে পড়েছে। ইতিমধ্যে 'নৈবেদ্য'-এর পর 'খেয়া', 'শিশু' ও 'গীতাঞ্জলি' রচিত হয়ে গেছে। 'গীতাঞ্জলি'তে এক সম্পূর্ণ নূতন সুর ধ্বনিত হয়েছে। 'চিত্রা'য় যে 'জীবনদেবতা'র ক্ষণিকের আবির্ভাব দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই জীবনদেবতা এখানে তাঁর সমগ্র মনখানি দখল করে বসেছেন। তাঁর সহিত বিচ্ছেদে দুঃখ. মিলনের আকূতি এবং মিলন হলে আনন্দানুভূতি —এইগুলিই তার কবিতাগুলির প্রেরণা। তবু তখনও তিনি বাঙালীর কবিই রয়ে গিয়েছেন। ভারতের পূর্বাংশের এক স্থানীয় ভাষায় রচিত হয়ে তাঁর সাহিত্য তখনও অঞ্চলের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিশ্বের মানুষের কাছে তাঁর কবিকীর্তি বা মনীষা তখনও অজ্ঞাত রয়ে

গিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ কতকগুলি অসংলগ্ন ঘটনার সমাবেশে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হল যা তাঁকে আকস্মিক ভাবে বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত ক'রে দিলে। তিনি আবিষ্কার করলেন হঠাৎ তিনি বিশ্ববিখ্যাত মানুষ হয়ে পড়েছেন। সেই ঘটনাগুলি এবার সংক্ষেপে বর্ণনা করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবন একরকম ভেঙ্গে পড়েছিল। তার পর তাঁর জীবনে এক গভীর বিষাদের অধ্যায় প্রবর্তিত হয়েছিল। তা পরপর দ্বিতীয়া কন্যার মৃত্যু, পিতার মৃত্যু এবং কনিষ্ঠ পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুদ্বারা চিহ্নিত। তার পর জ্যেষ্ঠপুত্র যখন উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় প্রবাসী হলেন তখন তিনি সংসারে একান্তই একা হয়ে পড়েছিলেন। এইভাবে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বিয়োগ-সঞ্জাত শোকের আঘাত, সাংসারিক বিশৃঙ্খলা এবং সেবাযত্ন করবার লোকের অভাবে তাঁর স্বাস্থ্য একরকম ভেঙ্গে পড়ল। এই অবস্থায় চিকিৎসকরা তাঁকে উপদেশ দিলেন বিলাতে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে বিলাত যাবার সব ব্যবস্থা পাকা হয়েও শেষ অবস্থায় তাঁর অসুস্থতার জন্য পণ্ড হয়ে গেল। নূতন ক'রে যাবার ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। এখন সে সময়টা কি ক'রে এবং কোথায় কাটাবেন সেটা হয়ে দাঁড়াল সমস্যা। তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ডাক্তার তাঁকে সকল প্রকার পরিশ্রম করতে নিষেধ ক'রে দিয়েছেন ; এমন কি নূতন সাহিত্যিক রচনাও নিষিদ্ধ। সুতরাং শান্তিনিকেতনে ফিরে যাওয়া চলে না। এদিকে কলিকাতায় দিন কাটাতেও তিনি রাজী নন। তাই ঠিক হল তিনি শিলাইদহে থাকবেন। সেখানে ত মনের মত পরিবেশ জুটল, কিন্তু সময় কাটে কি করে ? এই অবস্থায় তিনি ঠিক করলেন তাঁর বাংলায় রচিত কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করে সময় কাটাবেন। কবিতাগুলি নির্বাচিত হয়েছিল বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থ হতে, তবে তাদের মধ্যে 'গীতাঞ্জলি'

ও 'গীতিমাল্য'-এর কবিতাই সংখ্যায় প্রধান্য লাভ করল। এই ভাবেই ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি'র জন্ম হল।

ইতিমধ্যে বিলাতে জাহাজে করে যাত্রার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল এবং এবার তিনি বিনা বাধায় ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি লণ্ডনে উপস্থিত হলেন। তাঁর ইচ্ছা, সেখানে বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিকদের কাছে তাঁর কবিতার অনুবাদগুলি পাঠ করে শোনান। সে ইচ্ছা পূরণ হল বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রশিল্পী রদেনষ্টাইনের আনুকূল্যে। অনুবাদ পাঠের ব্যবস্থা হল ৭ই জুলাই ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁরই গৃহে। এই সাহিত্যিক বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে হেনরি নেভিনসন, এজরা পাউণ্ড এবং মে সিনক্লেয়ার অন্যতম। স্বয়ং আইরিশ কবি ইয়েটস ইংরাজি অনুবাদগুলি পাঠ করে শোনালেন।

ফল হল অভাবনীয়। যাঁরা শ্রোতা ছিলেন তাঁরা শুধু মুগ্ধ হলেন না, তারা ভক্ত হযে দাঁড়ালেন। তাঁরা ঠিক করলেন ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি'র প্রকাশের ভার তাঁরাই নেবেন। সুতরাং তাঁদের প্রযোজনায় ইণ্ডিয়া সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের শেষে ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশ হল। গ্রন্থখানির বিজয় অভিযান অব্যাহত রইল। যা ইংরাজী-সাহিত্যরসিকদের কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধির হৃদয় জয় করেছিল ও ইংরাজীভাষী পাঠকের মনও জয় করে নিল। তাঁর খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ল। যিনি ছিলেন ভারতের এক অখ্যাত প্রদেশের কবি তিনি কতকগুলি অসংলগ্ন ঘটনার বিচিত্র সমাবেশে হয়ে পড়লেন এক বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যশিল্পী। সে খ্যাতি নোবেল পুরস্কারের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ফলে পরের বছর নভেম্বর মাসে খ্যাতিমান সাহিত্যশিল্পীর জন্য যে চূড়ান্ত স্বীকৃতির ব্যবস্থা আছে সেই পুরস্কারের জন্য এই অনুবাদ গ্রন্থখানি নির্বাচিত হল।

এই ঘটনার তাৎপর্য গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। তার সার্থকতা শুধু ভারতবাসীর আত্মশ্লাঘাবোধকে তা পরিপুষ্ট করেছিল বলে নয়

তার সার্থকতা অন্যভাবে; তা ভারতের বাণী শোনবার উপযুক্ত মনোভাব পশ্চিমের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এবং সেই বাণী শোনাবার ভার কার ওপর ন্যস্ত হবে তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল। মোট কথা তা রবীন্দ্রনাথের জীবনকে নূতন পথে প্রবর্তিত করেছিল। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ভারতের বাণী শোনাবার ভার তাঁকেই নিতে হবে। এই ভাবেই সেই নাটকীয় ঘটনার সার্থকতা।

ঠিক বলতে কি নোবেল পুরস্কার লাভের পূর্ব হতেই তাঁর মনে এই ভূমিকার কথা উদয় হয়েছিল। তিনি জানতেন ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি হতে পৃথক এবং সেই জন্যই তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের প্রয়োজন। তার পরিণতি উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর হবে। বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্যই এই পথে মিলনের প্রয়োজন আছে। এই যে কথাটি তাঁর মনে জেগেছিল সেটি প্রথম সুযোগেই তিনি প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। উপলক্ষ্যটি ছিল এই ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি' পাঠের পর তাঁর অনুরাগী সাহিত্যিক-গোষ্ঠী লণ্ডনে তাঁর অভ্যর্থনার যে আয়োজন করেছিলেন তাই। সেই সভায় তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার মধ্যে সেই প্রাসঙ্গিক অংশটি পাওয়া যাবে। তাতে তিনি বলেছিলেন:

'প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকবে এবং পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য থাকবে—ভগবান করুন তার অন্যথা যেন না হয়; কিন্তু শান্তির পরিবেশে পরস্পর মনের মিল রেখে প্রীতির সম্বন্ধে তাদের মিলতে হবে, তাদের ভিন্নতা হেতু সে মিলন আরও ফলপ্রসূ হবে; সমগ্র মানব জাতির বেদীমূলে পবিত্র বিবাহ বন্ধনে সে মিলনের পরিণতি ঘটতে হবে।'

৩

সম্ভবত তখনই তাঁর মনের মধ্যে উকি দিচ্ছিল ভারতের আধ্যাত্মিক দৌত্যের ভূমিকা গ্রহণ করবার কথাটা। বিশ্ববাসীর সহিত মিলন-সেতু রচনা করবার প্রয়োজনীয়তা তখন তিনি বিশেষভাবে অনুভব

করেছিলেন। তার পর আরও কিছু নূতন ঘটনার চাপ সৃষ্টি হবার ফলে তাঁর মনে আর দ্বিধা রইল না যে ভারতের হয়ে বাণী শোনাবার ভার তাঁকেই নিতে হবে। তাঁর অন্তরের তাগিদ বাহির হতে সমর্থন পেয়ে তাঁকে এ বিষয় নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল।

প্রথম কথা ভারতের পক্ষ হতে যে এই রকম একটা দৌত্যের প্রয়োজন ছিল এবং রবীন্দ্রনাথ যে এই দায়িত্ব পালনে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছিলেন তার স্পষ্ট প্রমাণ তাঁর কাছে অভাবনীয় ভাবে এসেছিল। সে কালের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক স্বয়ং এ বিষয় তাঁর কাছে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। শুধু প্রস্তাব নয়, আর্থিক সাহায্য করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

রাজনৈতিক নেতার কাছ হতে এই প্রস্তাব আসাতে রবীন্দ্রনাথের মনে একটা সংকোচ জাগা স্বাভাবিক যে তাঁকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার হয় ত একটা ইচ্ছা প্রস্তাবের পিছনে থাকতে পারে। তাঁর নিজের ইচ্ছা হল এ বিষয় কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত না হওয়া। বিশুদ্ধভাবে সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের আদর্শের দ্বারাই তিনি অনুপ্রাণি · ছিলেন। বিভিন্ন দেশের সহিত মানসিক সম্পদের আদান প্রদানই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। বিষয়টি পরিষ্কার করে নেবার উদ্দেশ্যে তিনি তিলকের নিকট আরও স্পষ্ট কথা শুনতে চেয়েছিলেন। উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে তাঁরও উদ্দেশ্য নয় এই কাজের সঙ্গে রাজনীতিকে জড়ানো। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের প্রমাণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' হতে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। প্রাসঙ্গিক অংশটি হল এই :

'তখন লোকমান্য টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়ে-

ছিলেন, আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন্-কো-অপারেশন আরম্ভ হয় নি বটে কিন্তু পোলিটিকাল আন্দোলনের তুফান বইছে।

....তিনি বলে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তাঁর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ, এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি।'

দ্বিতীয় কথা ভারতের বাহিরের মানুষের আমন্ত্রণ। সে আমন্ত্রণ ঠিক বলতে কি শুরু হয়েছিল তাঁর ইংরাজী অনুবাদ ইয়েটস কর্তৃক পাঠের পর বিলাতে তাঁকে নিয়ে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল তার অব্যবহিত পরেই। তখনও নবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি, কিন্তু তাঁর কথা শোনবার জন্য পশ্চিমের মানুষ সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সে আমন্ত্রণ এসেছিল তিনি বিলাতে থাকতে থাকতেই আমেরিকা হতে। তাতে সাড়া দিয়ে তিনি নিউইয়র্ক, আর্বানা, শিকাগো, রচেষ্টার এবং বোষ্টন ঘুরে নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে ছ মাস কাটিয়ে এসেছিলেন। এইখানে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি তাঁর ইংরাজী গ্রন্থ 'সাধনা'য় প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

তার পর যখন নোবেল্ পুরস্কারের কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাহিত্যশিল্পীর জন্য বিশ্বে যে সর্বোচ্চ স্বীকৃতির ব্যবস্থা আছে তার দ্বারা ভূষিত করলেন তখন ত কথাই নেই। নানা দেশ থেকে বছরের পর বছর তাঁর কাছে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল, অতিথি হয়ে ভারতের হয়ে বাণী শোনাবার জন্য। এমন কি সামনে দীর্ঘ চার বৎসরব্যাপী বিশ্বমহাযুদ্ধের বাধাও বিশ্ববাসী স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। তার মধ্যেই আমেরিকা এবং জাপান হতে ডাক এসেছিল ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। কারণ, ভারতের বাহিরের মানুষ আবিষ্কার করেছিল তিনি শুধু কবি নন, বা অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট মনীষী নন, তিনি ভারতের সংস্কৃতির প্রতীক

এবং ভারতের বাণী বহন করবার উপযুক্ত মুখপাত্র। এ মন্তব্য পশ্চিমের মানুষেরই।[১]

সুতরাং তিনটি মূল শক্তির আকর্ষণ ভারতের সাংস্কৃতিক দূতের ভূমিকা গ্রহণ করতে তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। প্রথম, নিজের অন্তর হতে উদ্ভূত একটি প্রবল আকূতি। দ্বিতীয়, ভারতের নেতৃস্থানীয় মানুষের কাছ হতে তার সমর্থন এবং তৃতীয়, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক হিসাবে তাঁকে স্বীকার করে বাহিরের মানুষের তাঁর বাণী শোনবার জন্য আগ্রহ।

এতগুলি শক্তির একত্র সমাবেশ ঘটেছিল বলেই মনে হয় তিনি এমন উৎসাহভরে এবং হৃদ্যতার সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। কোনো আমন্ত্রণ প্রত্যাখান হয়েছে বলেও ত বিশেষ জানা নেই। যে দেশ হতে আমন্ত্রণ এসেছে তা ছোট হক বড় হক সমান আদরেই গৃহীত হয়েছে। তাই দেখি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পেরুর স্বাধীনতার শতবার্ষিক উৎসবের আমন্ত্রণ তিনি ঐকান্তিক আগ্রহভরে গ্রহণ করেছেন। এমন কি পথে বুয়েনসএয়ার্স-এ পীড়িত হয়ে বাধা পেয়েও তিনি সেখানে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার ইচ্ছা ত্যাগ করতে পারেন নি। একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর নির্বন্ধাতিশয্যই তাঁকে শেষে নিরস্ত করেছিল। আবার দেখি পশ্চিমের জাতিগুলি যাকে অপাঙক্তেয় করেছিল সেই নূতন রাজনৈতিক আদর্শ অনুপ্রাণিত সোভিয়েট রাশিয়া হতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন নিমন্ত্রণ এলো তখন তাও তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ পর্ব শেষ হল তখনই যখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর শারীরিক সামর্থ্য এতখানি সংকুচিত হল যে তাঁর পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ

১ 'He is not only the Poet Laureate of Asia and a great world personality, but he is the spokesman of India and the living symbol of her culture.'

—*Lectures and Addresses, Preface.*

আর সম্ভব রইল না। শেষ বিদেশ ভ্রমণ ঘটে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সিংহলে। তখন তাঁর বয়স তিয়াত্তর বছর অতিক্রম করেছে। সুতরাং পরিণত বার্ধক্যেও তিনি বিদেশের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন। হিসাব করলে দেখা যাবে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর হতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মোট দশবার বিদেশ ভ্রমণে বাহির হয়েছিলেন এবং মোট প্রায় ষাট মাস এইভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বিদেশে কাটিয়েছিলেন। বিশ্বের এমন বিখ্যাত দেশ ছিল না যেখানে তিনি যান নি। মোটামুটি দেখা যায় কেবল আফ্রিকা মহাদেশই প্রধানত বাদ পড়েছিল। তার একটা কারণ ছিল। ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আফ্রিকাবাসী নানা জাতিগুলিকে এমন ভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছিল যে তাদের জাতি হিসাবে পৃথক অস্তিত্ব ছিল না।

ভারতের হয়ে দৌত্য করবার ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের যে কঠিন কায়িক পরিশ্রম করতে হয়েছিল তার ধারণা করা যায় তাঁর ভ্রমণের স্থায়িত্ব এবং ব্যাপকতা হতে। এখানে চুম্বকে তার একটা বিবরণ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর তিনি যে দশবার বিদেশ ভ্রমণ করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

১) মে ১৯১৬ হতে মার্চ ১৯১৭ পর্যন্ত। ভ্রমণ করেছিলেন জাপান ও আমেরিকা।

২) মে ১৯২০ হতে জুলাই ১৯২১ পর্যন্ত। ভ্রমণ করেছিলেন ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রানস, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইটজারল্যাণ্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, অষ্ট্রিয়া ও পোল্যাণ্ড।

৩) ১৯২৪এর মার্চ হতে জুলাই পর্যন্ত। ভ্রমণ করেছিলেন মালয়, চীন ও জাপান।

৪) সেপটেম্বর ১৯২৭ হতে ফেব্রুয়ারি ১৯২৫। পেরুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে রওনা হয়ে পথে অসুস্থতার জন্য আর্জেনটাইনার বুয়েনাস-এয়ার্স-এ আটকে পড়েছিলেন।

৫) ১৯২৬এর মে হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত। ভ্রমণ করেছিলেন ইটালি, সুইটজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, বালগেরিয়া, রোম্যানিয়া, তুরস্ক, গ্রীস ও মিশর।

৬) ১৯২৭এর জুলাই হতে অক্টোবর পর্যন্ত! ভ্রমণ করেছিলেন মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, শ্যামদেশ।

৭) ১৯২৯ মার্চ হতে জুলাই পর্যন্ত। ভ্রমণ করেছিলেন জাপান, কানাডা ও শ্যামদেশ।

৮) ১৯৩০এর মার্চ হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত। ভ্রমণ করেছিলেন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইটজারল্যাণ্ড, রাশিয়া ও আমেরিকা।

৯) ১৯৩২এর এপ্রিল হতে জুন পর্যন্ত। ভ্রমণ করেছিলেন ইরান ও ইরাক।

১০) ১৯৩৪এর মে হতে জুন। ভ্রমণ করেছিলেন সিংহল।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এই আয়াসসাধ্য কাজটি কি করে তিনি বছরের পর বছর প্রৌঢ় বয়স হতে বার্ধক্য পর্যন্ত সম্পাদন করতে পেরেছিলেন। অবশ্য কতকগুলি জিনিস তাঁর পক্ষে এই কর্তব্য সম্পাদনকে সহজসাধ্য করেছিল। প্রথমত, যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাতে অন্তরের অনুমোদন ছিল এবং স্বদেশ তথা বিদেশের মানুষদেরও তাতে সমর্থন ছিল। দ্বিতীয়ত, মনে হয় দেশভ্রমণ তাঁর কাছে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। বলতে গেলে তা যেন তাঁর একটি নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাল্যকালে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর বদ্ধ পরিবেশের মধ্যে বাস করে তাঁর যেন দূরকে পাবার আকর্ষণ রীতিমত তীব্র হয়ে উঠেছিল। তাঁর সেই বাল্যের আকূতি সাহিত্যে তাই নানা ভাবে ভাষা পেয়েছিল। তাঁর 'সুদূরের পিয়াসী' কবিতায় তা সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট। সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরীর আহ্বানে সাড়া না দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। তাঁর লিরিক-ধর্মী নাটিকা 'ডাকঘরে' ও সুদূরকে পাবার আকূতিই মূল সুর। অজানাকে জানবার, দূরকে নিকট করবার, পরকে আপন করবার আকর্ষণ তাঁর রক্তের মধ্যে যেন মিশে গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের এই ভ্রমণের তৃষ্ণা সম্ভবত খানিটা পৈত্রিক সূত্রেও পাওয়া। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও ভ্রমণের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। যৌবনে নৌকা যোগে নানা জায়গায় তিনি ঘুরতে ভালোবাসতেন। প্রতি বৎসর পূজার সময় তিনি দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। প্রৌঢ় বয়সে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের জন্যও তিনি নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বার্ধক্যে যতদিন পর্যন্ত তাঁর শরীর ভ্রমণের কষ্ট বহন করবার শক্তি রেখেছে ততদিন তিনি উত্তর ভারত এবং হিমালয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। যখন নিনান্তই শরীর অক্ষম হয়ে পড়েছে তখনই তিনি যাযাবর জীবন ত্যাগ করেছেন।

৪

এবার আমরা ভারতের আধ্যাত্মিক দূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতের বাহিরে নানা দেশের মানুষকে কি কথা শুনিয়েছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। একটা জিনিস প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাজনৈতিক আলোচনার ধারে কাছেও তিনি যান নি। কারণ তিনি ভারতের প্রকৃত সাংস্কৃতিক দূতের ভূমিকাতেই নিজের মন্তব্য এবং ভাষণগুলিকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর কালের পরিবেশে ভারতের হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হত, কারণ তখন প্রত্যেক ভারতবাসী বিদেশীর শাসনাধীনে থেকে গভীর মর্মপীড়া অনুভব করত। কিন্তু সেটা তাঁর রুচিতে বেধেছিল। হতে পারে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার আকস্মিক সংযোগের ফলে ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়েছিল ; কিন্তু সে দুর্ভাগ্য ত তার সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যকে কালিমা-

মণ্ডিত করতে পারে নি। তাঁর ভূমিকা ছিল সেই ঐশ্বর্যের পরিচয় বিশ্ববাসীকে দিয়ে আসা। সুতরাং এই সুযোগে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার করতে গেলে তাঁর ভূমিকার মর্যাদার হানি হয়। তিনি অনুযোগ করতে বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভিক্ষা করতে বিশ্ববাসীর দ্বারস্থ হতে আসেন নি, তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে এসেছিলেন। একটা উদার মনোভাব নিয়ে তিনি রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্দ্ধে থেকে বিশ্ববাসীর সহিত ভারতের মৈত্রী স্থাপন করতে এসেছিলেন। অন্তর হতেই তিনি দূরকে নিকট এবং পরকে আপন করতে চেয়েছিলেন।

বিদেশে প্রদত্ত তাঁর ভাষণগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় সেগুলি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত দেখি তিনি ভারতের সংস্কৃতির পরিচয় দিতে তার নানাদিক দিয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয়ত দেখি বিদেশের মানুষকে নিজের কথাও শুনিয়েছেন। তৃতীয়ত দেখি তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমালোচকের ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন। প্রথম দুটি বিষয় প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর ভূমিকার মধ্যে সঙ্গতভাবে আসে। তৃতীয় বিষয়টি কিন্তু ঠিক প্রাসঙ্গিক-ভাবে আসে না। সেটা বোধ হয় ইচ্ছা না থাকলেও তিনি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পশ্চিমের প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বের মানুষকে নানাভাবে নিপীড়িত করবার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করতে যে পরিমাণ কাঁচামাল চাই তা বিশ্ব হতে লুঠ করে না আনলে যন্ত্রের ক্ষুধা নিবারণ করা যায় না। আবার যন্ত্রের বিপুল উৎপাদন শক্তি যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে তার বিপণনের জন্যও বাহিরে তার বাজার খোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে পশ্চিমের রাজশক্তিগুলির তুলনায় অনগ্রসর দেশের স্বাধীনতা হরণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ত তা জীবনকে যন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করতে দ্রুততালে পরিচালিত করল। সাংস্কৃতিক বা আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ করবার

মত মানুষের অবসর আর রইল না। তৃতীয়ত যান্ত্রিক উৎপাদনের বিপণনের প্রয়োজনে কৃত্রিমভাবে ভোগ্য পণ্যের চাহিদা-বোধ বৃদ্ধি করা হল। ফলে মানুষের জীবন এক নতন ধরনের শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে পড়ল। উপনিষদের ভাষায় হয়ত একে 'বিত্তময়ী শৃঙ্কা' বলা চলে। তাঁর সংবেদনশীল মন এই অনাচার সহ্য করতে পারে নি। নানাভাবে পশ্চিমের সংস্কৃতি তাঁর মনের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। তাই আবেগের আতিশয্যে তাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ না ক'রে থাকতে পারেন নি। আশ্চর্যের কথা এই যে পশ্চিমের মানুষ তা শুনেছিল এবং তার জন্য তাঁর প্রতি কোনো অসৌজন্য প্রদর্শন করে নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তা প্রধানত দুটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে। প্রথমত বলেছেন শান্তিনিকেতনে স্থাপিত তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা। কি অবস্থায় তিনি তা গড়ে তুললেন, কেন গড়ে তুললেন, তার বৈশিষ্ট্য কি—এই গুলিই সেখানে তাঁর আলোচনার বিষয়। নিজের অন্তরের তাগিদেই যে তিনি তা গড়ে তুলেছিলেন সে কথাই সেখানে তিনি বলেছিলেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের সেবাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং এটি তাঁর সাধন-জীবনের অঙ্গ ছিল। তাঁর অন্তরে তিনি দুটি প্রবল আকূতি অনুভব করেছিলেন। একটি হল একাকী ঈশ্বর সাধনার অপরটি হল একাকী নিভৃতে বসে কাব্যচর্চা বা ধর্মসাধনা নয়, বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগ। প্রথমটির প্রতীক 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের 'আবেদন' শীর্ষক কবিতাটি। দ্বিতীয়টির প্রতীক এই কাব্যগ্রন্থেই সন্নিবিষ্ট 'এবার ফিরাও মোরে' শীর্ষক কবিতাটি। প্রথমটিতে তিনি মানসী দেবতাকে নিভৃতে সেবা করবার প্রার্থনা জানিয়েছেন। দ্বিতীয়টিতে তিনি বহুভাবে কর্মক্ষেত্রে বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁর সাধনজীবনের এমন এক অবস্থায় তিনি উপনীত হয়েছিলেন যখন নিভৃতে একাকী বসে ধ্যানধারণায়

তিনি তৃপ্তি পেতেন না। তিনি অন্তর হতে চেয়েছিলেন কোনো স্বার্থগন্ধহীন পরার্থপ্রণোদিত কাজে আত্মনিয়োগ করতে।[২] তাই তিনি শিক্ষার্থীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একথা তিনি তাদের শুনিয়েছিলেন।

তিনি আরও ঘনিষ্ঠভাবে ব্যক্তিগত কথারও অবতারণা করেছিলেন। তা হল তাঁর অধ্যাত্মজীবনের সাধনার কথা। গোষ্ঠীগত প্রচলিত ধর্মে তিনি তৃপ্তিবোধ করেন নি। তিনি নিজের মতিগতির পথে সাধনা ও চিন্তার সাহায্যে নিজের ধর্ম নিজে আবিষ্কার করে নিয়েছেন। এমন কি দিব্যদর্শনলব্ধ উপলব্ধিও এ বিষয় তাঁর সহায়তা করেছে।[৩] ঠিক বলতে কি এমন ধর্ম-সচেতন কবি বিশ্বের সাহিত্যে আর দ্বিতীয় পাওয়া যাবে না। ফলে এমন একটি জিনিস আমরা পাই যা বিশ্বের সাহিত্যে দুর্লভ বস্তু। তাঁর ধর্মচিন্তাই তাঁর কবিতার প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনও হয়েছে যে প্রায় সমগ্র কাব্যগ্রন্থ জুড়ে অধ্যাত্মিক অনুভূতি ও আলোচনা কবিতাগুলির বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি' ও 'গীতিমাল্য' এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক রকম বলতে গেলে তাঁর সাধনজীবন এবং কাব্যজীবন পরস্পর ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয় নিজেও এক সময় সচেতন হয়েছিলেন।[৪] তাঁর সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলির কথা তিনি বিদেশের মানুষকে শুনিয়েছেন। তা বলতে যে তাঁর বাধে নি তার

২ 'I am sure I vaguely felt that my need was spiritual self-realisation in the life of man throug'' ome disinterested service'. (*Religion of Man, The Teacher*)

৩ *The Religion of Man, The Vision.*

৪ 'My religious life has followed the some mysterious line of growth as my poetical life, Some how they are wedded to each other and though their betrothal had a long perid of ceremony it was kept secret to me'. (*Religion of Man, The Vision.*)

সম্ভবত কারণ তাঁর ইংরাজি গীতাঞ্জলির পশ্চিমের মানুষের হাতে যে সমাদর ঘটেছিল তাই দেখে। সেখানেও ত প্রধানত তাঁর ঈশ্বর-সাধনা সম্পর্কিত অনুভূতি নিয়েই কবিতাগুলি রচিত। তবু প্রযুক্তি-বিদ্যা-ভিত্তিক বস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে বাস করেও পশ্চিমের মানুষ তার রস আস্বাদন করবার ক্ষমতা রেখেছিল।

এই প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা ভ্রমণের সময় যে বক্তৃতাগুলি তিনি দিয়েছিলেন তাদের বিষয় ছিল প্রধানত ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ কথা। সে সময় প্রদত্ত ভাষণগুলি একত্রিত ক'রে 'সাধনা' নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল। ভাষণগুলি তাঁর বাংলা রচনা বা ভাষণের ইংরেজি অনুবাদ। এখানে ভারতের মানসিক সম্পদের কথাই মূল আলোচনার। কিন্তু ক্রমশ দেখি সংকোচবোধ কাটিয়ে তিনি পরবর্তী-কালে বিদেশ ভ্রমণের সময় নিজের কথাও বলতে শুরু করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা ভ্রমণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে প্রদত্ত বিষয়গুলির অন্যতম ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রমের কথা। সেখানে প্রদত্ত ভাষণগুলির অবশ্য প্রধান বিষয়বস্তু ছিল শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। তাঁর ধারণায় শিল্পচর্চার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুরণের কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। সেই কারণেই প্রদত্ত ভাষণগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় গ্রন্থখানির বোধ হয় নামকরণ করেছিলেন 'পারসোনালিটি'।

প্রকৃত আত্মস্মৃতি সম্বন্ধে তাঁর প্রথম আলোচনা পাই ১৯২১ খৃষ্টাব্দে চীনে প্রদত্ত বক্তৃতা মালায়। বক্তৃতাগুলি একত্রিত ক'রে 'দি রিলিজিয়ান অফ্ এ্যান আর্টিস্ট' নাম দিয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থের প্রদত্ত যে ভাষণগুলি স্থান পেয়েছে তাতে আছে তাঁর সাধনজীবনের কথা।

এই সাধনজীবনের কথা সব থেকে বিস্তারিতভাবে আলোচিত

হয়েছে তাঁর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতামালায়। এই ভাষণগুলি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রদত্ত হয় এবং গ্রন্থাকারে সাজিয়ে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থখানি অনেক দিক হতে বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ। তাঁর অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাস এখানে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তার ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে তাঁর অধ্যাত্ম-জীবন তরুণ বয়স হতে শুরু করে তাঁর রচনার মধ্যে আজীবন পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছিল।[৫] তাঁর বিভিন্ন বয়সের রচনাগুলি নিজস্ব সাধনালব্ধ উপলব্ধি দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ায় তাদের মধ্যে তার বিকাশের ইতিহাস পরোক্ষভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং যা তাঁর সাহিত্যে এবং ভাষণে ধীরে ধীরে প্রকটিত হয়েছে তা এখানে একস্থানে সাজিয়ে স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থখানি তিন দিক হতে মূল্যবান। এই অনন্য-সাধারণ সাধক কবির সাধনলব্ধ উপলব্ধির প্রথমে এখানে বিস্তারিত বিবরণ পাই। দ্বিতীয় কথা, সেই কারণে এটি একটি মূল্যবান দার্শনিক গ্রন্থ। বলতে গেলে ভারতে অনেককাল পরে নূতন মৌলিক দার্শনিক তত্ত্বের নূতন করে জন্মলাভ ঘটেছে এই গ্রন্থে। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরে ভারতে মৌলিক দার্শনিক আলোচনা লোপ পেয়ে গিয়েছিল। ফলে দার্শনিক আলোচনা বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের পরিপোষকদের পরস্পর বিতর্ক বা কোনো প্রখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থের, নিজ মতের অনুকূল ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ ছিল। তৃতীয়ত, তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রচনার, বিশেষ করে কবিতাগুলির মূল প্রেরণার স্থান অধিকার করায় তাঁর কাব্য বোধের সূত্রগুলি এর মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের দুর্ভাগ্য এমন গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ এখনও হল না।

---

৫ 'In fact, a very large portion of my writings beginning from the earlier products of my immature youth down to the present time, carry an almost continious trace of the history of the growth.' (*Religion of Man, Preface.*) .

প্রশ্ন উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্রতী বা সাধক হিসাবে অভিজ্ঞতা ভারতের দূতের ভূমিকায় ভাষণের বিষয় হিসাবে ব্যবহার করা সঙ্গত হয়েছিল কিনা। এ বিষয় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পূর্বে দুটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতে এমন এক কবির আবির্ভাব ঘটেছে যাঁর রচনা পশ্চিমের মানুষের মনকে মুগ্ধ করেছে। সে কারণে এটি একটি অভাবনীয় ঘটনা। সুতরাং তাঁর নিজের কথা শোনবার জন্যে বিদেশীদের মনে আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক। এই কথা বিবেচনা করেও রবীন্দ্রনাথ এ বিষয় উৎসাহিত বোধ করে থাকতে পারেন।

দ্বিতীয়ত আরও বড় কথা হল তাঁর নিজের বিষয় বলতে গেলেও ত একভাবে ভারতের কথাই বলা হয়। ভারতের ঐতিহ্যে তিনি মানুষ, ভারতের প্রাচীন মানসিক সম্পদের ওপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। শৈশবে এবং প্রথম যৌবনে তাঁর পরিবারে যে সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছিলেন তা ছিল জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত। সুতরাং তাঁর বেশে এবং আচরণে, চিন্তায় ও সাধনায়, ভারতীয় ভাবধারা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। উপনিষদের বাণী তাঁকে নিত্য প্রেরণা দিয়েছে। ভগবানবুদ্ধের করুণা তাঁকে শ্রদ্ধাবিষ্ট করেছে। বাংলার বাউলের সাধনা তাঁর সাধক জীবনের দিক নির্ণয় করেছে। কালিদাসের সাহিত্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে। প্রাচীন ভারতের তপোবনের শান্তির পরিবেশ তাঁর মনকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি যে বিদ্যানিকেতন গড়ে তুলেছিলেন তা তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত। এমন কথা বোধ হয় বলা যায় যে তাঁর মধ্যে যেন ভারত-সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ, যা কিছু প্রজ্ঞায় ভাস্বর সবই নূতন করে জন্মলাভ করেছে। তাঁর ধ্যানধারণার মধ্যে ভারতেরই ভাবধারা প্রতিফলিত। সুতরাং তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলা মানে ভারতের কথা বলাই হয়ে দাঁড়ায়।

এ বিষয় দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে

স্বভাবতই শান্তিনিকেতনে স্থাপিত তাঁর নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা মনে উদয় হয়। তা ভারতীয় আদর্শের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত। শহর হতে দূরে প্রকৃতির কোলে অবস্থিত তপোবনের শান্ত পরিবেশে আচার্যের সঙ্গে বাস করে বিদ্যাচর্চার যে আদর্শ সেখানে প্রতিফলিত তা সেই ভারতেরই প্রাচীন আদর্শ। সংস্কৃত সাহিত্যে বিভিন্ন কবির রচনায় তপোবনের যে মনোহর বর্ণনা আছে তা পড়ে তিনি কতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন তা তাঁর 'তপোবন' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। সেখানেই উল্লেখ আছে এই তপোবনে বিদ্যাচর্চার আদর্শই ভারতের জাতীয় শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত। সেই কারণেই তিনি নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি এইভাবে গড়ে তুলেছিলেন।

তাঁর সাধনজীবনের কথাও ভারতেরই সাধনার কথা। তাঁর মধ্যে যেন দুটি মূল আধ্যাত্মিক ভাবধারা সমন্বয়ের সূত্রে মিলিত হয়েছে। সেই দুটি ভাবধারা হল ব্রহ্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব। প্রথমটির বিকাশক্ষেত্র উপনিষদ এবং দ্বিতীয়টি গড়ে উঠেছিল ভক্তিবাদী শাস্ত্রে এবং বাউলদের সাধনায়। প্রথমটির মতে বিশ্বসত্তা এই বিশ্বের মধ্যেই বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে প্রচ্ছন্নরূপে বিরাজমান। ব্রহ্ম শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাই। যা সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছে তাই ত ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক সত্তারূপে পরিকল্পিত। সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করে যে মহাশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল ইনি হলেন তাই। এঁর ব্যক্তিত্ব নেই বলেই ইনি পুরুষ বা নারী বলে কল্পিত হন নি। অপর পক্ষে ভক্তিতত্ত্বের পরিকল্পনায় ঈশ্বর ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট। তিনি ভক্ত হতে পৃথক। সেই কারণেই উভয়ের মধ্যে একটি প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে ওঠা সম্ভব। ব্যক্তিত্বের সীমায় না বাঁধলে ত বিশ্বসত্তার সহিত ভক্তিরসের সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে না। এই ভাবেই এই দুটি তত্ত্বের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে একটি বিরোধের সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়।

রবীন্দ্রনাথ তার সাধনজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই দুটি তত্ত্বকেই এক রকম স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং এক অভিনব পথে তাদের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। এই মীমাংসা দুটি তত্ত্বের মিশ্রণে একটি তৃতীয় তত্ত্ব গড়ে তুলে সাধিত হয় নি। তাঁর দর্শনে এই দুটি তত্ত্বকেই যুগপৎ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাঁর ধারণায় বিশ্বসত্তার একই সঙ্গে দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ ঘটে থাকে। একটি কাজের প্রকাশ এবং অন্যটি আনন্দের প্রকাশ। ব্যক্তিগত জীবনেও তার পরিচয় আমরা পাই। আমরা যখন আপিসে বসে কাজ করি তখন আমাদের প্রকাশ অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক ধরনের। সেখানে যখন কারও সঙ্গে কাজের বিষয় আলোচনা করি তাতে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের লেশ মাত্র থাকে না। আবার যখন ঘরে ফিরে পরিবারের মানুষের সঙ্গে মিলিত হই তখন আমাদের আচরণ প্রীতির স্পর্শে মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। সেটা আমাদের ব্যক্তিসত্তার আনন্দের প্রকাশ। সেইরূপ বিশ্বসত্তার কাজের প্রকাশ পাই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণে। সেখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা হিসাবে বিশ্বের নিয়ামক শক্তি রূপে ক্রিয়াশীল। এ প্রকাশে ভক্তিরসের স্থান নেই।

অপর পক্ষে যেখানে আনন্দের প্রকাশ সেখানে তিনি ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট সত্তা হিসাবে ভক্তের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে উন্মুখ। তিনি মানুষের হৃদয়ের দ্বারে এসে বলেন—'আমার প্রীতি তোমায় দিচ্ছি, তোমার প্রীতি আমাকে দাও'। ভক্ত যদি সেটা উপলব্ধি করে এবং বাহির পানে চোখ না ফিরিয়ে অন্তরে তাঁকে স্থাপন করে তা হলে উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে একটি প্রীতির যোগসূত্র গড়ে উঠতে পারে। তাই তিনি গেয়েছেন—

চেয়ে দেখিস নারে হৃদয় দ্বারে কে আসে যায়।
ও তোর চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।[৬]

৬ অরূপরতন

এই ধারণাটিকে ঘিরেই তাঁর 'জীবনদেবতা'-তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। তাঁকে ঘিরেই আনন্দের প্রকাশ।[৭]

রবীন্দ্রনাথ দুটি তত্ত্বকেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। উপনিষদে দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের এই বচনে পাই—

যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলন ঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্যবর্ণ গন্ধগীত করিতে রচনা ;[৮]

যাকে রবীন্দ্রনাথ আনন্দের প্রকাশ বলেছেন তাতে বিশ্বসত্তা ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট হয়ে দাঁড়ান। তাঁর রূপ কিন্তু নেই ; তাই তিনি অরূপরতন। তাঁকে বাহিরে কোথাও দেখা যায় না, অন্তরের মধ্যে অনুভব করা যায় ; তাই তিনি অন্ধকার ঘরের রাজা। তিনি ব্যক্তির হৃদয়ে অধিষ্ঠান নিয়ে ব্যক্তিবিশেষের জীবনকে গড়ে তোলেন, তাই তিনি জীবনদেবতা। এই জীবনদেবতাই যে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বসত্তার ব্যক্তিরূপ তা তাঁর 'আত্মপরিচয়' শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে স্পষ্ট স্বীকৃত হয় নি। তাই এ নিয়ে অনেক বিতর্ক উঠেছে। তাঁর 'রিলিজিয়ান অফ ম্যান' গ্রন্থে তা এক রকমভাবে স্বীকৃত।[৯] আর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'সৌন্দর্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তা স্পষ্টভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে একই বিশ্বসত্তার দুই ভিন্নরূপে যুগপৎ প্রকাশ

৭ শান্তিনিকেতন, সৌন্দর্য,

৮ স্মরণ, রমণী

৯ It may be that it was the same creative thing that is shaping the universe to its eternal idea ; but in me as a person it has one of its special centres of a personal relationship (*Religion of Man, The Vision*)

সম্ভব ; তাদের একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তিরূপে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অপরটি ব্যক্তিসত্তা রূপে মানুষের সহিত প্রীতির আদান-প্রদান করতে উন্মুখ।

রবীন্দ্রনাথের সাধনজীবনে এইভাবে ভারতের দুটি মূল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সহাবস্থিতির স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতামালায় তাঁর এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা সবিস্তারে বলা হইয়াছে। সুতরাং তা এ ভারতেরই আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা। সেখানেও তিনি নিজের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে ভারতেরই বাণী ভারতের বাহিরের মানুষকে শুনিয়েছেন।

৫

রবীন্দ্রনাথ বিদেশে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে সোজাসুজি ভারত সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তার বিষয়গুলি ছিল প্রধানত এই : প্রথমত উপনিষদ এবং ভগবান বুদ্ধের বাণী সম্বন্ধে তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁর বিবেচনায় এগুলি ভারতের মানসিক সম্পদের শ্রেষ্ঠ অংশ। সুতরাং তা তাঁর ভাষণের একটি মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্য একটি বিষয় তাঁর মনকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। তা হল প্রাচীন ভারতের আশ্রম ধর্ম। কারণ এই ব্যবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মের ভিত্তিতে মানুষের জীবনকে নিরাসক্তভাবে সুসংবদ্ধ করা হয়েছে ; বাসনার বন্ধনে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ হয়ে জীবনকে আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা সেখানে লক্ষিত হয় না। আরও একটি জিনিস তাঁর ভাষণের বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়েছিল, তা হল সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের কথা। মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে যে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর সম্বন্ধে কবিতায়, ভাষণে, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রচিত বিরাট সাহিত্যে কত যে আলোচনা ছড়িয়ে আছে তা বর্ণনা করা যায় না। তা নিয়ে একটি সারগর্ভ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থও রচনা করা যেতে পারে। বিদেশে প্রদত্ত ভাষণে যে

তিনি কালিদাসের কথা স্মরণ করেছেন তা মহাকবির প্রতি তাঁর নিগূঢ় শ্রদ্ধার অতিরিক্ত প্রমাণ।

এবার এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কিছু উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। পশ্চিমের মানুষের কাছে স্বীকৃতি পাবার অব্যবহিত পরেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দেবার যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তাতে ভারতের দূত হয়ে প্রথম অর্ঘ্য যে সাজিয়েছিলেন তাতে উপনিষদ এবং ভগবান বুদ্ধের বাণী গৌরবের স্থান পেয়েছিল। ঠিক বলতে কি তিনি তখনও নোবেল পুরস্কার পান নি। তবে লণ্ডনে তাঁর কবিতার পঠনকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য বিদগ্ধ সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি হল তা তাঁর খ্যাতিকে সমগ্র পশ্চিমের জগতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেই সূত্রেই সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা হতে নিমন্ত্রণ এল বক্তৃতা দেবার। তখন তিনি তাঁর বিভিন্ন বাংলা রচনা হতে চয়ন ক'রে কয়েকটি আলোচনার ইংরাজি অনুবাদকে ভিত্তি ক'রে তাঁর বক্তৃতামালা তৈরি করেছিলেন। সেগুলি পরে 'সাধনা' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মূল বিষয় হল উপনিষদের বচন এবং ভগবান বুদ্ধের বাণীর ব্যাখ্যা। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থখানির মুখবন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তার অনুবাদ উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

'আমার কাছে উপনিষদের কাব্য এবং বুদ্ধের বাণী আধ্যাত্মিক সম্পদ বলে মনে হত, সুতরাং তার মধ্যে অন্তহীন প্রাণশক্তি অধিষ্ঠিত; এবং আমার কাছে তথা অন্যের কাছে তাদের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বিবেচনায় সে বাণীগুলিকে আমার জীবনে এবং উপাসনায় প্রদত্ত ভাষণে ব্যবহার করেছি।'

ভারতে আশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর প্রশস্তি তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায় একটি বিশিষ্ট অংশ জুড়ে আছে।[১০] এখানে মোটামুটি তিনি বলতে চেয়েছেন ফুলের সঙ্গে মানুষের জীবনের একটি সাদৃশ্য আছে। ফুল ফুটে ঝরে গিয়ে ফল হবার পথ মুক্ত করে দেয়; ফল আবার

---

১০ *Religion of Man*, chap. XIV, The Four Stages of Life.

পেকে মাটিতে পড়ে যায় যাতে নূতন গাছের জন্ম হতে পারে। অনুরূপভাবে স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করে শৈশবে নিজেকে ফুটিয়ে তোলে, তাই হল তার ফুলের অবস্থা। পরে শিক্ষার অধ্যায় শেষ করে সে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করে ; তাই হল তার ফলের অবস্থা। শেষ জীবনে বার্দ্ধক্যে সংসার হতে সরে গিয়ে জ্ঞানযোগে বিশ্বসত্তার সহিত সংযোগ স্থাপন করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থেকে মৃত্যুকে বরণ করে ; তাই হল তার পাকা ফলের মত ঝরে পড়ার অবস্থা। তিনি তাই বলেছেন :

'ব্যক্তিসত্তা হতে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী হতে বিশ্বে এবং বিশ্ব হতে অসীমে ব্যক্তিসত্তার এই হল স্বাভাবিক গতি।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায় কালিদাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। বর্তমানকালে পাশ্চাত্য দেশের প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক সংস্কৃতি মানুষের মনে যে অবসাদের সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে কালিদাসের কালের একটি সাদৃশ্য তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। সেই সূত্রেই এই প্রসঙ্গের তিনি অবতারণা করে-ছিলেন। বিষয়টি পরবর্তী আলোচনায় আপনি এসে পড়বে বলে এখানে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে না। তবে এখানে কালিদাস সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে স্থাপন করা যেতে পারে। পরবর্তী আলোচনার জন্য তা আমাদের মনকে প্রস্তুত করবে।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন কালিদাসের সাহিত্যে তপোবন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসেছে। তপোবনের বর্ণনা এমন দরদ দিয়ে তিনি রচনা করেছেন যে তা শুধু সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসাবে অপূর্ব মহিমামণ্ডিত হয় নি, মনকেও গভীরভাবে স্পর্শ করে। তাঁর 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের আরম্ভই হয়েছে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমের বর্ণনা দিয়ে। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'এর একটি বড় অংশ তপোবনের পরিবেশে রচিত। তার আরম্ভ তপোবনের পরিবেশে শেষ ও তপোবনের পরিবেশে। প্রথম অঙ্ক আরম্ভ হয়েছে

কণ্ব মুনির আশ্রমে আশ্রম-বৃক্ষদের আলবালপূরণে নিযুক্ত শকুন্তলা আর তার সখীদ্বয়কে নিয়ে। তা শেষ হয়েছে মহর্ষি মরীচের আশ্রমে। মাঝে একটি সমগ্র অঙ্কই আশ্রমে সংঘটিত। শকুন্তলার আশ্রম হতে বিদায় গ্রহণের কাহিনী সেখানে বর্ণিত।

এই তপোবনের বৈশিষ্ট্য হল এখানে সংসার ত্যাগ করে মানুষ সন্ন্যাস-জীবন যাপনের জন্য আসে না। এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা সপরিবারে এসে গৃহীর মতই বাস করেন। এখানে থাকেন জ্ঞানচর্চার জন্য, অধ্যাত্মসাধনার জন্য। নগরীর কোলাহল এবং কৃত্রিম পরিবেশের কঠোরতা হতে মুক্তি পাবার জন্যই প্রকৃতির কোলে তাঁরা সমাজ রচনা করেন। এখানে পরিবেশ নির্ম্মল, প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সন্নিধি বিশ্বকে মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দেয়। এখানে ইতর প্রাণী মানুষের সঙ্গে নিরাপদে বাস করে, কারণ পরিবেশের গুণে এখানে মানুষ হিংসার সংস্পর্শ বর্জিত। গাছপালাও এখানে জড়পদার্থ বিবেচিত হয় না, তারাও আদরের বস্তু। তাই দেখি আশ্রমকন্যাগণ আশ্রমের গাছের পরিচর্যায় সহোদরার স্নেহ উজাড় করে দেয়। গাছে যখন তারা জল দেয় তার গোড়ায় যে জল সঞ্চিত হয় তা আশ্রমের পাখি এসে নির্ভয়ে পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে। সেখানে হরিণ স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ কার। কোনও হরিণ শাবকের মাতৃবিয়োগ ঘটলে আশ্রম কন্যা তাকে সন্তানের মত পালন করবার ভার নেয়। এই স্নেহ একমুখী নয়, উভয়মুখী। হরিণশাবকও মাতৃজ্ঞানে পালিকা মাতার এমন অনুরক্ত হয়ে পড়ে যে আশ্রম ত্যাগ করবার কোনো উপলক্ষ্য ঘটলে পালিকা মাতার আঁচল টেনে ধরে বাধা দেয়।

অপর পক্ষ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে 'মেঘদূতের' যক্ষের বর্ণনায় এবং তার প্রেরিত বাণীতে এমন একটি মর্মস্পর্শী বিষাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে যা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা জিনিস না হয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের ধারণা যক্ষকে উপলক্ষ্য করে মহাকবি এখানে নিজের

মনের বিষাদের কথাই বলেছেন। এ তো শুধু বিরহীর প্রিয়ার সঙ্গ হতে বিচ্ছেদজাত ব্যথা নয়। এ আরও বেশী; এ হল কবির আত্মার মন-কেমন করা।[১১]

কিন্তু কেন এই মন-কেমন-করা? মহাকবির ত আপাত দৃষ্টিতে মন কেমন করবার কোনও কারণ ঘটে নি। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে তিনি বাস করেন। তার সমৃদ্ধি এবং সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। মহাকবিরই বর্ণনায় তা যেন স্বর্গ হতে একটি খণ্ড চুরি করে এনে সেখানে স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর কবিখ্যাতি ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে। রাজসভার নবরত্নের তিনি অন্যতম রত্ন। জীবনকে পরিপূর্ণ সুখে মণ্ডিত করিবার সকল উপকরণই ত তাঁর হাতের নাগলের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের মত হল এই বাস্তব সমৃদ্ধিই তাঁর মন-কেমন-করার মূল কারণ। রাজসভার পরিবেশে বিলাস-বহুল জীবনের মধ্যে তিনি বিশ্বসত্তার স্পর্শ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ঐশ্বর্য দিয়ে গড়া যেন একটি স্বর্ণ-নির্মিত পিঞ্জরে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। প্রকৃতি এখান হতে নির্বাসিত; আকাশের মুক্ত অঙ্গনে বিচরণে তাঁর মনের অধিকার নেই। সেই কারণেই কবির মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেই বিষাদের গ্লানি পরোক্ষভাবে তাঁর 'মেঘদূতের' বর্ণনায় প্রতিফলিত হয়েছে।[১২] রবীন্দ্রনাথের মতে এই মন-কেমন-করা মহাকবির একার নয়, তা সেই যুগের সকল মানুষের। কারণ ভারতের ইতিহাসের এই যুগে মানুষ বৈষয়িক সমৃদ্ধির শীর্ষস্থানে উঠেছিল, কিন্তু তারই আনুষঙ্গিক ফল

১১ It was not the physical homesickness from which the poet suffered, it was something far more fundamental, the homesickness of the soul. (*The Rligion of Man, Teacher*)

১২ The poet in the royal 'court lived in banishment from the immediate presence of the eternal. (Ibid)

হিসাবে তারা তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্র হতে দূরে সরে এসেছিল। ফলে তপোবনের গৌরবময় যুগ তখন অস্তমিত। নাগরিক জীবনের বিলাসবাহুল্য মানুষের মনকে তখন বন্দী করে ফেলেছে।[১৩]

৬

তৃতীয়ত রবীন্দ্রনাথ বাহিরের মানুষের কাছে মনের কথা শোনাতে গিয়ে এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসেছেন। তিনি বিদেশে গিয়ে বিশেষ করে পশ্চিমের মানুষদের নূতন লব্ধ প্রযুক্তিবিদ্যা-ভিত্তিক সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে গিয়ে যাদের দেশে গিয়েছি তাদেরই সাংস্কৃতির সমালোচনা করে ভাষণ দেওয়া সাধারণ ক্ষেত্রে অসৌজন্য প্রকাশ করে। তাই এমন কথা বলতে স্বভাবতই সংকোচ আসা উচিত। রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যবোধ সর্বজনবিদিত। তাঁর প্রথম জীবনের নানা রচনার প্রতিকূল সমালোচনা শুনেও এই স্বাভাবিক সৌজন্যবোধবশত তিনি কোনো দিন রূঢ় কথা বলে তার প্রতিবাদ করেন নি। এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটার একটি কারণ ছিল। এই নূতন সংস্কৃতি মানুষকে যে পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে তিনি একান্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন বলেই তিনি এমন কাজটি করে বসলেন। শুধু পাশ্চাত্য জগৎ নয়, বিশ্বের মানুষের কল্যাণের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত, কারণ এই নূতন সংস্কৃতির প্রভাব সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হতে বাধ্য। তাই বিশ্বজনীন কল্যাণবোধ প্রণোদিত হয়েই তিনি এই অপ্রীতিকর কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

পশ্চিমের সংস্কৃতির বিজ্ঞান-ভিত্তিক। তা যে পরীক্ষা নিরীক্ষার

১৩ The age that had gathered its wealth and missed its well-being, built its storehouse of the things and lost its brckground of the great universe. (Ibid)

ফলে প্রকৃতির নানা রহস্য উদ্ঘাটিত করে মানুষের জ্ঞানের পরিধির বিস্তার ঘটিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই! যে প্রাকৃতিক নিয়ম জড় পদার্থকে নিয়ন্ত্রিত করে তা আবিষ্কার করে এবং পরে তাকে প্রয়োগ করে প্রভূত শক্তির যে সে অধিকারী হয়েছে তাও স্বীকৃত। এই প্রযুক্তিবিদ্যাকে ভিত্তি করেই যন্ত্রের অধিপত্য স্থাপিত হয়েছে। তার উপকারিতাও রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে প্রস্তুত। তাঁর অনুযোগ হ'ল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মনকে সংকুচিত করেছে এবং দ্বিতীয়ত, তার প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের মনকে লোভাতুর করে এমন বিভ্রাটের সৃষ্টি করেছে যে যন্ত্র মানুষের সেবা না করে তার নিপীড়নের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

তাঁর মতে মানুষের মনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সংকুচিত করে। স্থূল বস্তুকে নিয়ে নাড়ানাড়ি করে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হয়ে তার বাহিরে যে বিরাট মানসিক জগৎ পড়ে রয়েছে তার কথা বিজ্ঞান ভুলে যায়। তাঁর প্রতিপাদ্য বোঝাবার জন্য তিনি একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। কবিতা বুঝতে ব্যাকরণের যে ভূমিকা তার সঙ্গে বিশ্বকে বুঝতে বিজ্ঞানের ভূমিকার তিনি তুলনা করেছেন। কবিতার অর্থ বুঝতে ব্যাকরণের জ্ঞান যে প্রয়োজন তা স্বীকৃত; কিন্তু ব্যাকরণে যেটুকু বোঝায় কবিতায় তার অতিরিক্ত আরও জিনিস আছে যা তাকে শিল্পবস্তুতে পরিণত করে। সেইরূপ বিজ্ঞান ও বিশ্বের গঠনের প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য করে; কিন্তু বিশ্বে আরও অতিরিক্ত অনেক কিছু আছে যা তার নাগালের বাহিরে থেকে যায়। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনের জন্য তাঁর প্রাসঙ্গিক উক্তির অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে. তিনি বলেছেন:

'একটি কবিতার শব্দবিন্যাশ বিশ্লেষণ করতে যেমন ব্যাকরণের একটি বিধিসম্মত ভূমিকা আছে তেমন বিশ্বের গঠনপ্রকৃতি বিশ্লেষণে বিজ্ঞানের একটি প্রয়োগ ক্ষেত্র আছে। কিন্তু সৃষ্টি হিসাবে বিশ্ব ত গঠনের রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তার মধ্যে গঠনবিন্যাসের

অতিরিক্ত কিছু আছে। আমাদের মনকে যখন বিজ্ঞানরূপী ব্যাকরণ সম্পূর্ণ অধিকার করে বসে তখন ভুলে যাই যে তাও একটা কবিতার মত জিনিস।[১৪]

এর ফলে তাঁর মতে ধর্মের প্রভাব মানুষের মন হতে মুছে যায় এবং বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান-সম্ভূত ক্ষমতার লোভ মানুষকে পেয়ে বসে। পরিণতিতে তার মন খর্ব হয়ে যায় এবং কতকগুলি মূল্যবান মানসিক সম্পদের অধিকার হতে সে বিচ্যুত হয়। এই হল বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রযুক্তিবিদ্যার দোষ। তাঁর মতে শিল্পবিপ্লবের পর হতে এই কারণে পশ্চিমের মানুষের মন ক্রমশ যান্ত্রিক ক্ষমতার লোভের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এসেছে এবং ফলে এই ক্ষমতা-লোলুপতা তার মন থেকে উদার মানবিক সংস্কৃতির আদর্শকে মুছে দিয়েছে।[১৫]

বিজ্ঞানরুপী মন্দর পর্বত দিয়ে জ্ঞানসমুদ্র-মন্থন করে পশ্চিমের মানুষ যে প্রযুক্তিবিদ্যারূপ অমৃত-ভাণ্ড সংগ্রহ করল তার সঙ্গে দুটি বিষভাণ্ডও এসে জুটেছিল অঘটন সৃষ্টি করতে। সেই বিষভাণ্ড দুটির ভয়ংকর রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ আতঙ্কিত হয়েছিলেন। প্রযুক্তি বিদ্যা পশ্চিমের মানুষের হাতে এনে দিয়েছিলেন অপরিসীম ক্ষমতা। ক্ষমতা হতে এসেছিল লোভ। সেই লোভ হতেই এই দুটি গরল-ভাণ্ডের উৎপত্তি। যন্ত্রের দানবিক শক্তি শিল্প-উৎপাদনের হার কল্পনাতীত ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কাজেই কারখানার কাজ চালাবার জন্য একদিকে যেমন কাঁচা মালের অত্যধিক চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল তেমনি উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য নূতন ক্রেতার দল

---

১৪ *Creative Unity, The Modern Age*

১৫ 'In course of the last two centuries, however, the west found access to nature's store house of power, and ever since, all the attention has been irresistibly driven in that direction. Its inner ideal of civilisation has thus been pushed aside by the love of power.'

Civilisation and Progress (*Delivered in China in 1924*)

সংগ্রহ করারও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই কাঁচা মাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারের প্রয়োজনে পশ্চিমের শিল্পে-অগ্রসর জাতি-গুলি জঙ্গীজাতীয়তাদের আদর্শকে গ্রহণ করেছিল। দুর্বল জাতিকে করতলগত করে প্রথমত তাদের উৎপাদিত কাঁচা মাল সংগ্রহ করতে এবং দ্বিতীয়ত তা হতেই ভোগ্যপণ্য উৎপদান করে তাদের ব্যবহার করতে বাধ্য করবার জন্য তারা সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় গরল-ভাণ্ডের জন্মকথাও একই প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগে গড়ে তোলা যন্ত্রদানবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। কারখানাগুলির পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা এত বেশী যে অধীন জাতিগুলিকে ক্রেতা হিসাবে ব্যবহার করেও পণ্যের বিপণন সমস্যার সমাধান হয় না। সুতরাং দেশের মানুষকেই নানা কৃত্রিম উপায়ে ভোগ্যপণ্য ক্রয় করে ভোগ করবার উৎসাহ দেওয়া হল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হারে ভোগ্যপণ্য ভোগের প্ররোচনায় মানুষের জীবন এক কৃত্রিম পরিবেশ দ্বারা আচ্ছন্ন হল। ফলে তার জীবন হতে মাধুর্যের আস্বাদ মুছে গেল। এই হল দ্বিতীয় গরল ভাণ্ড।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে এই দুই মারাত্মক বিষের অনুপ্রবেশ ঘটতে দেখে যে আতঙ্কিত হয়েছিলেন তাতে বিস্মিত হবার কিছুই সেই। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল এই দুই গরলের বিষক্রিয়ার ফলে মানুষের জীবন হতে সকল মাধুর্য, সকল মহত্ত্ব নির্বাসিত হবে। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাই তিনি তার বিরুদ্ধে প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। বিষয়টি ভালো করে বুঝতে কিছু প্রাথমিক কথা অবতারণার হয়ে পড়ে।

মানুষ প্রকৃতির কোলে যখন প্রথম জন্মগ্রহণ করে তখন একান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে সে স্থাপিত হয়েছিল। অন্য জীবের বেলায় অন্নচিন্তা এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা প্রধানত প্রকৃতি নিজেই করে রেখে

দিয়েছিল। যার শিকার বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবিকানির্বাহ করতে হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র, তীক্ষ্ণ নখ ও দন্তরূপে দেহের সঙ্গেই সংযুক্ত হয়েছিল। যে তৃণভোজী সে আত্মরক্ষার জন্য পেয়েছিল দ্রুতগতি। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্যও অনুরূপভাবে জৈবিক উত্তরাধিকার হিসাবে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন সাজসজ্জা পেয়েছিল। মেরু দেশের ভাল্লুক পেয়েছিল পুরু পশমের পোষাক; মরুভূমিবাসী উট পেয়েছিল খাদ্য ও পানীয়কে দেহের মধ্যে সঞ্চয় ক'রে রাখবার ক্ষমতা। মানুষের বেলায় কিন্তু ব্যবস্থা হয়েছিল স্বতন্ত্র। প্রকৃতির যেন নির্দেশ ছিল যে নিজের বুদ্ধিশক্তির সাহায্যে মানুষ তার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ক'রে নিক। হাতিয়ারের দরকার হলে সে নিজে গড়ে নিক, পরিবেশের প্রতিকূলতাকে আয়ত্ত করবার প্রয়োজন হলে সে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নিজে তৈরি ক'রে নিক। এ বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য প্রকৃতি তাকে দিয়েছিল অতিরিক্ত বুদ্ধিশক্তি ধারণের উপযুক্ত দেহের অনুপাতে এক বিরাট মস্তিষ্ক এবং তার নির্দেশ পালনের জন্য দেহসঞ্চালনের কাজ হতে মুক্ত দুটি হাত। এই দুটি উপকরণের সহযোগিতায় সে জীবনের সমস্যাকে সমাধান করবার চেষ্টা ক'রে এসেছে। এই পথেই অগ্রসর হয়ে সে পশু হতে পৃথক হয়ে গড়ে উঠেছে এবং এই পথেই তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

কিন্তু তার জীবনসমস্যার সমাধান একদিনে হয় নি। দীর্ঘকাল প্রায় পশুর স্তরেই তাকে কাটাতে হয়েছিল। প্রথম অবস্থায় তার জীবনধারণ করতে হত ফলমূল আহরণ ক'রে বা শিকার বৃত্তি অবলম্বন ক'রে। হাতিয়ার হিসাবে সে ব্যবহার করতে শিখেছিল পাথরের খণ্ড। তাকে ঘষে মেজে সে শিকারের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত, আবার তাই দিয়েই মাংস কাটত এবং ছাল ছাড়াতো! এই কারণে তার পৃথিবীর বুকে নাতিদীর্ঘ জীবনের এই অধ্যায়টি সূচিত করতে একে পুরাতন প্রস্তর যুগ বলা হয়ে থাকে। জীবনধারণের সমস্যা

তখন তার ভালো ক'রে সমাধান হয় নি। সেকালে বাসের উপযুক্ত গৃহ তার ছিল না, গুহায় বাস করতে হত। অন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিদিন নূতন ক'রে আহার্য গ্রহণ করতে হত। এ অবস্থায় স্থিতিশীল জীবনও সম্ভব ছিল না। না ছিল আশ্রয়, না ছিল খাদ্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা। কাজেই জীবনে অবসর বলে তার কিছু ছিল না। নিজের উচ্চতর বৃত্তিগুলিকে বিকশিত করবার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। সে ছিল নিতান্তই প্রকৃতির অধীন। এইসব কারণে মানুষের জীবন যে তখন নিতান্তই সংকুচিত ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে মানুষ তখন অন্য জীবের মত একান্ত-ভাবেই বর্তমানের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[১০]

তার পর একদিন এল যখন সে নিজের বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ ক'রে ভূমি কর্ষণ ক'রে শস্য উৎপাদন করতে শিখল। আরও সূক্ষ্ম পাথরের হাতিয়ার নির্মাণ ক'রে সে লাঙ্গল বানাল এবং তার সাহায্যে ভূমি কর্ষণ ক'রে শস্য উৎপাদন করতে শিখল। এইভাবে যে ছিল অন্য জীবের মত খাদ্য-সংগ্রহকারী জীব সে রূপান্তরিত হল শস্য-উৎপাদন কারী জীবে। এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। তার পক্ষে এখন খাদ্য উৎপাদন ক'রে ভাণ্ডারে শস্য সঞ্চয় ক'রে রাখা সম্ভব হল। সে তখন জনপদ স্থাপন করল। সঙ্গে সঙ্গে গৃহপালিত পশু এসে জুটল। সমাজ গড়ে উঠল। নানা বৃত্তি গড়ে ওঠবার ফলে সমাজ বিন্যাসে জটিলতা এল। কেউ হল শস্য উৎপাদক, কেউ হল পণ্যদ্রব্য উৎপাদক। এই ভাবে চাষী এল, কামার এল, কুমার এল, তাঁতি এল। যখন ক্রয়বিক্রয়ের হিসাব রাখতে মসীজীবী এল লিখিত বর্ণের উদ্ভাবন হল। মানুষ লিখতে শিখল।

১০ 'Primitive man was occupied with his physical needs and thus restricted himself to the present which is the time boundary of the animal ; and he missed the urge of his consciousness to seek its emancipation in a world of ultimate human value.'

(*The Religion of Man, The Music Maker*)

এইভাবে নানা দিক থেকে মানুষের জীবনে বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। সমাজতত্ত্ববিৎ তাই তাকে মানুষের ইতিহাসে প্রথম বিপ্লব বলে আখ্যা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেন তার মূল তাৎপর্য হল এই যে তার ফলে মানুষ প্রকৃতির দাসত্ব হতে মুক্তি পেল। দৈনন্দিন জীবন যাপনের গ্লানি হতে মুক্ত হয়ে মানুষ অবসর পেল, তার মনে জীবনসমস্যা হতে মুক্ত একটি নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি এল। অন্তর হতে কে যেন তাকে বলল, এতদিন তুমি ছিলে প্রকৃতির দাস এখন মুক্ত হয়েছ, এখন নিজেই স্রষ্টার আসনে বস।[১১] এই পথেই মানুষের জীবনে শিল্প বল, সাহিত্য বল—এক কথায় যা কিছু তার জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে তা গড়ে উঠেছে।

তার পর মানুষের জীবনে আরও একটি তাৎপর্য পূর্ণ বিপ্লব এসেছে। তাকে সমাজতত্ত্ববিদ্‌ বলেন শিল্পবিপ্লব। এর আগে শিল্প যে ছিল না তা নয়, তবে তা গড়ে উঠেছিল মানুষের দৈহিক শক্তিকে ভিত্তি ক'রে। তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। একটি তাঁতি দিনে কটা কাপড় তার হস্তচালিত তাঁতে বয়ন করতে পারে তা হাতের আঙুলে গোনা যায়। কিন্তু এখন প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ ক'রে প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত ক'রে মানুষ এমন যন্ত্র সৃষ্টি করল যা প্রচণ্ড শক্তি ধারণ করে। আরব্য উপন্যাসের কল্পিত দানবের থেকে বহুগুণ তা শক্তিধর। এইভাবে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে যন্ত্রের আধিপত্য গড়ে উঠল। সেই যন্ত্রকে মানুষের ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে লাগানো হল। তার ফলে সমাজে আর-একবার যুগান্তকারী পরিবর্তন সংঘটিত হল।

১১ 'But above the din of the clamour and scramble rises the voice of the Angel of the Surplus, of leisure, of detachment from the compelling claim of physical need, saying to men, 'Rejoice'. From his original serfdom as a creature. Man takes his right seat as a creator.'

The Religion of Man, The Creative Spirit.

তাতে যেমন মানুষের বাস্তব সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেল তেমন সঙ্গে সঙ্গে এমন সমস্যারও উদ্ভব হল যা তার জীবনকে বিড়ম্বিত করল। তাই বলছিলাম যে, প্রযুক্তিবিদ্যাকে মন্থন-দণ্ড হিসাবে ব্যবহার ক'রে মানুষ যেমন বাস্তব সমৃদ্ধি আয়ত্ত করেছে তেমন দুটি বিভ্রান্তিকর সমস্যারও সম্মুখীন হয়েছে।

অবশ্য মানুষের জীবনে যন্ত্রের যে স্থান আছে রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করেন। বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে যন্ত্রকে সম্পূর্ণ বর্জন করবার উপদেশ দেবেন এমন অবিচক্ষণ তিনি নন। তবে তা অপরিহার্য বলে অবাধে তাকে বিস্তার লাভ করতে দেওয়া হবে তা তিনি চান নি। বর্তমান যুগে তাকে অতিমাত্রায় বিস্তার লাভ করতে দেওয়ার ফলে যে মানবজাতির কল্যাণ ব্যাহত হচ্ছে তা তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং সেই কারণে তার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন জীবনের দাবি যন্ত্রের পুরোভাগে, কারণ জীবন সৃষ্টিধর্মী আর যন্ত্র কেবল নির্মাণধর্মী। মানুষের মধ্যে যে শক্তি ক্রিয়া করে তা জানে কেমন ক'রে নিজেকে গোপন রেখে শিল্পবস্তুর সৃষ্টি করতে হয়। আর যন্ত্রের মধ্যে যে শক্তি ক্রিয়া করে তা জানে তার করাল দংষ্ট্রা লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশ করতে এবং নিজেকে অপ্রীতিকর ক'রে তোলবার ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করতে। ফলে মানুষের জীবনের স্বাভাবিক গতি একান্তভাবে ব্যাহত হয়ে পড়ে। এই কারণেই তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে যন্ত্রের অশুভ সংযোগের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ করেছেন।[১২]

রবীন্দ্রনাথের মতে এই অশুভ সংযোগের ফলেই দুটি বিষকুম্ভ মানবজাতির কল্যাণকে ব্যাহত করতে চলেছে। তাদের একটি

১২ 'Let us know that Machine is good when it helps, but not so when it exploits life; that Science is great when it destroys evil, but not when the two enter into unholy alliance.'

The Religion of Man, The Meeting

হল জঙ্গীজাতীয়তাবাদ প্রণোদিত উগ্রসাম্রাজ্যবাদ এবং অপরটি হল যন্ত্রের অত্যধিক আধিপত্যের ফলে মানুষের জীবনের সংকোচন। এখন আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তাঁর বিদেশে ভ্রমণের সময় প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণ হতে কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উদাহরণ হিসাবে এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

জঙ্গীজাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ বেশ কঠোর ভাষায় উচ্চারিত হয়েছিল। তা বুঝতে দেয় তার হৃদয়হীনতা এবং অবিচার তাঁর মনকে কতখানি আঘাত করেছিল। তিনি বলেছেন বিজ্ঞানসাধনায় লব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ ক'রে সাংঘাতিক মারণ অস্ত্র উদ্ভাবন ক'রে তা দুর্বল জাতিগুলির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয় তাদের পরাজিত ক'রে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধবার জন্য।[১৩]

অন্য জাতির উপর দাসত্ব আরোপ করার মূল উদ্দেশ্যে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত পণ্য হতে মুনাফা অর্জনে এই জবর দখল করা দেশগুলিকে দুভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রথম, কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য এবং দ্বিতীয়, উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য। এর সপক্ষে কোনো নৈতিক সমর্থন নেই। নীতিবোধকে পদদলিত ক'রেই পরের ধন এইভাবে লুট করা হয়। আর তাকে সহজসাধ্য করবার জন্য তাদের পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরানো হয়। ফলে বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জাপান ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে এ বিষয় কঠোর ভাষায় বেশ স্পষ্ট মন্তব্য করেছিলেন। এমন কি পশ্চিমের মানুষের এই অন্যায় আচরণের কথা উল্লেখ ক'রে অতিরিক্তভাবে এমনও ইঙ্গিত করেছিলেন যে জাপানীরা

১৩ 'They assert their aristocracy not merely through their home made science but through the coercion of darker continents to slavery by the shattering argument of bomb.'

Lectures and Addresses, International Relations.

তাদের এই নীতিবিরুদ্ধ আচরণের অনুসরণ করছে এবং তাই দেখে আমরা ভারতবাসীরা তাকে বাহবা দিচ্ছি। এই ইঙ্গিত করার একটা কারণ ছিল। এসিয়ার দেশগুলির মধ্যে জাপান যেমন সর্বপ্রথম পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে প্রযুক্তি বিদ্যার সাধনা করেছিল, তেমনি তার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে জঙ্গীসাম্রাজ্যবাদেরও উপাসক হয়ে বসেছিল। জাপান রাশিয়াকে হারিয়ে কোরিয়া দখল ক'রে নিয়েছিল। তার পর তার শিল্পের প্রসারের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চীনের কাছ হতে মাঞ্চুরিয়া কেড়ে নিয়ে গেল। এই অন্যায় অচরণ তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তাই দেখি তাঁর ভাষা বেশ কঠোর হয়ে উঠেছে। এখানে তাঁর মন্তব্যের অনুবাদ উদ্ধৃত করলে তাঁর প্রতিবাদের কঠোরতা হৃদয়ঙ্গম হবে। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি ছিল এই :

'কিন্তু জাতীয়তাবাদ কি ফল প্রসব করেছে? তা হল ধ্বংসের এবং মুনাফা উপার্জনের যন্ত্রগঠন এবং কূটনীতির দ্বিমুখী আচরণ। তাদের আঘাতে নৈতিক দায়িত্ব বোধ ধূলিলুণ্ঠিত এবং মানবিক ভ্রাতৃত্ব বোধের আদর্শ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। লোভে পড়ে কিংবা সম্ভবত এক রকম বাধ্য হয়ে তোমরা সেগুলিকে গ্রহণ করেছ আর সেই জন্য আমরা ভারতবাসীরা তোমাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করছি।'[১৪]

এই তো গেল পরাধীন দেশের নিপীড়নের কথা। জঙ্গীজাতীয়তাবাদের যারা সাধনা করে তারা নিজের দেশেরও কি কম দুর্দশা ঘটিয়েছে? দেশের মানুষকে তারা পরিপূর্ণ মানুষ রূপে গড়ে উঠতে দেয় নি। তাদের পরিণত করেছে অর্থ উপার্জন ও যুদ্ধ জয়ের উপযোগী যন্ত্রে। ফলে মানুষ সেখানে আর মানুষ নেই, মানুষ সেখানে যন্ত্রের মত আচরণ করে। সমাজের মানুষ যেন অপর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে পুতুলের মত নিস্পৃহভাবে নাচে। সজীব

১৪ *Lectures and Addresses, Interational Relations.*

মানুষ আর দেখা যায় না; মানুষ যন্ত্রের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এ সম্বন্ধে তাঁর প্রতিবাদ এমন মর্মস্পর্শী যে তা উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা যায় না। নীচে তার অনুবাদ দেওয়া হল :

'জাতীয়তা দীর্ঘকাল বেড়ে উঠেছে মানুষকে পঙ্গু ক'রে। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ জাতীয়তার কারখানায় রূপান্তরিত হয় যুদ্ধের উপযোগী এবং মুনাফা অর্জনের উপযোগী সংখ্যাতীত পুতুলে; তাদের ত্রুটিহীন যান্ত্রিকতা নিয়ে হাস্যাস্পদ আত্মগৌরববোধ-প্রণোদিত আচরণ মনে বেদনা জাগায়। মানব সমাজ ক্রমবর্ধমান হারে পুতুল নাচের প্রদর্শনীতে পরিণত হয়; রাজনীতিজ্ঞ, সৈনিক, শিল্পপতি এবং আমলারা বিস্ময়কর দক্ষতায় সুতো টানার ফলে সেখানে নাচে।'[১৫]

এ বিষয় রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে 'নৈবেদ্য'-এর একটি চতুর্দশপদী কবিতায়। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে উদ্ধৃত করা হল :

'আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্ররুধিরপুষ্ট বিলাসলালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জে মুখর ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্ধায়।'

প্রযুক্তিবিদ্যা-ভিত্তিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁর দ্বিতীয় অভিযোগ হল তা মানুষের জীবনকে সংকুচিত করেছে। সেটা ঘটেছে এই ভাবে। যন্ত্র এমন শক্তি ধারণ করে যে তার উৎপাদনক্ষমতা চাহিদা থেকে বেশী হয়। ফলে তার বিপণনের সমস্যাটা বড় হয়ে পড়ে। কারণ উৎপন্ন পণ্য বিপণন না হলে তো কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। সেই কারণে যেমন তার চাহিদা বৃদ্ধির জন্য শিল্পে অগ্রসর জাতিগুলি অন্য

১৫ *Nationalism, Nationalism in the West.*

দেশকে অধীনতাবদ্ধ ক'রে বিপণনের ক্ষেত্রকে বাড়াবার চেষ্টা করেছে, তেমন দেশের অভ্যন্তরে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য নানা উপায়ে মানুষের বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই যথেষ্ট, কিন্তু সিগারেট ধরাবার যন্ত্র অতিরিক্ত ভাবে উৎপাদিত হয়ে বাজারে ছাড়া হয়েছে। এই ভাবে কৃত্রিম উপায়ে ভোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন ও চাহিদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাদের সহজলভ্য করবার জন্য ভাড়া ক'রে কিনে নিয়ে মূল্য শোধের প্রথা চালু হয়েছে। ফলে লোভে পড়ে মানুষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ্যপণ্য এই প্রথায় কিনে ঋণ-ভারগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তা পরিশোধ করতে তার অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। এইভাবে শিল্পে উন্নত দেশের মানুষ ভোগ্যপণ্য উৎপাদন, বিপণন এবং ভোগের কাজে নিজেকে সর্বক্ষণ ব্যস্ত রাখতে বাধ্য হয়। তার অন্য নানা ক্ষুধা উপেক্ষিত হয়ে উপবাস করে।

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা এর ফলে মানুষের কল্যাণ রীতিমত ব্যাহত হবে। তার পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশের সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে যাবে। যন্ত্রের স্বার্থে সে যন্ত্রের পরিপোষক জীবে পরিণত হবে। তার অর্থ হল মানুষ কৃষিবিপ্লবের আগে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। সে যুগে মানুষ ছিল খাদ্য সংগ্রহকারী জীব; যাযাবর জীবনে আত্মরক্ষা ও আহার্য সংগ্রহেই তার সমস্ত সময় ও সামর্থ্য ব্যয়িত হয়ে যেত, সাংস্কৃতিক সাধনার সুযোগ পেত না। যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রসারের ফলে মানুষের আবার সেই দশা ঘটতে চলেছে। কেবল মাত্র যন্ত্রনির্ভর অর্থনীতির ক্রীড়নকে রূপান্তরিত হয়ে মানুষের জীবন নিতান্তই সংকুচিত হয়ে পড়েছে।[১৬]

১৬ 'Modern civilization for the same reason seems to turn itself back to that primitive mentality. Our needs have multiplied so furiously fast that we have lost our leisure for the deeper realization our self. (*The Religion of man, The music maker*)

তাঁর এই প্রতিপাদ্যকে ভালো ক'রে বোঝাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন পাখীর আকাশে বিহরণের অধিকার জন্মগত। সেখানে সে পক্ষ বিস্তার ক'রে অবাধ মুক্তির আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু সে তো সর্বক্ষণ উড়তে পারে না, তার বিশ্রামের জন্য একটি আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন। সেই আশ্রয়স্থল হল তার নীড়। তা সে নিজেই তৈরি ক'রে নেয়। এখন সেই পাখীকে যদি কেউ সোনার পিঞ্জরে আবদ্ধ করে, নীড়ের থেকে আবাস স্থান হিসাবে তা অনেক বেশী মূল্যবান হবে নিশ্চিত, কিন্তু তার জন্য তাকে অন্য ভাবে মূল্য দিতে হবে অনেক। আকাশে অবাধে বিচরণের অধিকার হতে সে বিচ্যুত হবে।

তাঁর ধারণায় বর্তমান যন্ত্র যুগে যন্ত্রেরই স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের অত্যধিক ব্যবহারে বাধ্য করবার ফলে মানুষ অনুরূপভাবে সোনার খাঁচায় বন্দী হয়েছে। যন্ত্রকে জীবিত রাখবার জন্য ভোগ্য-পণ্যের কৃত্রিমভাবে অত্যধিক বর্ধিত ব্যবহার মানুষকে যন্ত্রের আশ্রিত ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। সে অবসর হারিয়েছে, তার বিভিন্ন মানসিক ক্ষুধা যা তাকে মানবিক সম্পদের অধিকারী করেছিল তা অনাদরে অবহেলায় শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। এই ভাবে মানুষ নিজেই নিজেকে ঘিরে একটি সুবর্ণপিঞ্জর নির্মাণ ক'রে মুক্তজীবন হতে নিজেকে নির্বাসিত করেছে।[১৭]

তাঁর এই সাবধান বাণী পশ্চিমের তথা বিশ্বের মানুষের মনকে স্পর্শ করবে কিনা জানা যায় না! তবে যদি না করে তা হয়ে দাঁড়াবে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে মারাত্মক দুর্ভাগ্যের বিষয়। কারণ

১৭ 'The nest is simple, it has an early relationship with the sky, the cage is complex and costly; it is too much itself ex-communicated from whatever lies outside. And man is building his cage, fast developing his parasitism on the monster Thing, which he allows to envelop him on all sides.' (*The Religion of Man, The Teacher*)

এই যন্ত্রভিত্তিক সভ্যতা অতি দ্রুত সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তার ফলে তার মধ্যে লুকানো যে মারাত্মক বিষ আছে তা মানবজাতির কল্যাণকে খর্ব করবার ক্ষমতা রাখে। এর প্রতিষেধক ব্যবস্থার নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে যন্ত্রভিত্তিক সভ্যতার এই ভয়াবহ দিকটির প্রতি সম্প্রতি পশ্চিমের মানুষেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই সভ্যতার শৈশবের যুগে এর বিরুদ্ধে দুর্বল প্রতিবাদ কয়েক জন মনীষী করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ফরাসী মনীষী রুশো, মার্কিন দার্শনিক থোরো এবং রুশ সাহিত্যশিল্পী টলস্টয়-এর প্রতিবাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে তখনও তার রূপের ভয়াবহতা ততখানি প্রকট হয় নি। সম্প্রতি আরও প্রতিবাদ আরও শক্ত ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে। মার্কিন মনীষী এরিক ফ্রম-এর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি যে কথা বলেছেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বহু পূর্বে উচ্চারিত সাবধান বাণীর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তিনিও বলেছেন যে বর্তমান যন্ত্রনির্ভর অর্থনীতির প্রভাবে মানুষের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা প্রকৃত প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে কৃত্রিম উপায় বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে। ফলে ভোগের তৃষ্ণা প্রকৃত প্রয়োজনের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্য রক্ষা করে না। পণ্য বস্তু ভোগ এখন আর অন্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। তার প্রতি আকর্ষণ এক অহেতুক দুর্বার তৃষ্ণায় পরিণত হয়েছে। ফলে মানুষ, যে যন্ত্রভিত্তিক অর্থনীতি তার সেই তৃষ্ণার তৃপ্তির বৃথা চেষ্টা করে তার উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এইভাবে মানুষ এই নূতন অর্থনীতির ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে।[১৮]

১৮ 'Consumption was a means to an end, that of happiness. It now has become an end in itself The constant increase oi need forces us to an ever increasing effort, it makes us dependent on these needs and on the people and institutions, by whose help we attain them' *Erich Froman, The Save Society. p. 135.*

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা

১

মানবিকতা কথাটি দর্শনের পরিভাষা হিসাবে নূতন সৃষ্টি হয়েছে। তা বলে যে তত্ত্বে মানুষের স্বার্থ এবং কল্যাণ কেন্দ্রস্থল অধিকার করে তাই মানবিকতাধর্মী। কিন্তু তা এত রকম বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে আমাদের বর্তমান আলোচনায় কোন অর্থে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে সে বিষয় আমাদের একটি নিশ্চিত ধারণা ক'রে নেওয়া উচিত। তা না হলে আমাদের বর্তমান আলোচনা ব্যাহত হবে কারণ কি বলতে চাই সে বিষয় অস্পষ্টতা এসে পড়তে পারে।

রিউমস সংকলিত দার্শনিক অভিধানে[১] দেখা যায় সাতটি ভিন্ন অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের প্রয়োগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কোনোটি পঠনের বিষয়, কোনোটি নীতিশাস্ত্রের, কোনোটি দর্শন শাস্ত্রের, কোনোটি ধর্মের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। এদের বিস্তারিত আলোচনার বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে না। আমরা স্পষ্টতই বর্তমান আলোচনায় তাকে ধর্ম-সম্পর্কিত পারিভাষিক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করব। সুতরাং ধর্মতত্ত্বের পরিভাষা হিসাবে তা কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেটুকু আলোচনা করলেই চলবে। মানবিকতার এই প্রসঙ্গে অর্থ দাঁড়ায় এই যে ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্মের আবশ্যিক অঙ্গ বলে গ্রহণ করবার প্রয়োজন নেই, তবে এই চিন্তায় ঈশ্বরকে একেবারে বর্জন করবার প্রস্তাবও হয় নি। মানুষের কল্যাণই এখানে ধর্ম আচরণের মূল অবলম্বন হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ইউনি-টারিয়ান সম্প্রদায়ের খৃষ্টানদের দ্বারা এই তত্ত্ব প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল।

আমরা এই অর্থেই বর্তমান আলোচনায় এই পারিভাষিক

১ D. D. Rumes, Dictionary of Philosophy.

কথাটির ব্যবহার করব। অর্থাৎ সেই তত্ত্বকেই মানবিকতাবাদী বলব যা ধর্ম আচরণের ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ এবং মানুষের সেবাকে প্রধান মূল্য দেয়। তার অর্থ ধর্ম আচরণের লক্ষ্যবস্তু হবে মানুষ। এই দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বর চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, নাও পারে। আমাদের আলোচনায় দেখব যে এই ভিত্তিতে এই তত্ত্বের শ্রেণী বিভাগ সম্ভব। এক শ্রেণী ঈশ্বরকে স্বীকার ক'রে নিয়ে মানবিকতা প্রচার করে; আবার এক শ্রেণী আছে যা ঈশ্বরকে বর্জন ক'রে বিশুদ্ধভাবে মানবসেবার আদর্শই প্রচার করে। প্রসঙ্গত দুই শ্রেণীর মানবিকতার আলোচনার মধ্যেই আমাদের জড়িয়ে পড়তে হবে।

আমরা প্রথমে ঈশ্বর-বর্জিত মানবিকতার একটু পরিচয় দেব। তার সুন্দর উদাহরণ মেলে ফরাসী দার্শনিক কোঁত-এর নৈশ্চিত্তিক দর্শনে।[২] কোঁত-এর মনে হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির একটি সংঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে মনে হয় তিনি এক দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। তার প্রভাব তাঁর দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্মের ভিত্তি হল আমাদের থেকে এক মহত্তর সত্তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন ও সেবার আকূতি। সেটি হৃদয়বৃত্তির ব্যাপার। প্রচলিত ধর্ম সাধারণত সেই শ্রদ্ধা ও সেবার পাত্র হিসাবে যাঁকে আমাদের নিকট স্থাপন করে তিনি হলেন ঈশ্বর। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে সেই ঈশ্বরে বিশ্বাসে কি বুদ্ধিবৃত্তির সমর্থন পাওয়া যায়? তিনি এ বিষয় অনুসন্ধান ক'রে হতাশ হয়েছিলেন। অনুসন্ধানের ফলে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা হল এই।

তাঁর ধারণায় মানুষের চিন্তা অগ্রগতির পথে তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়। প্রথম হল ধর্মচিন্তার অবস্থা।[৩] এই অবস্থায় মানুষ অপ্রাকৃত সত্তার সাহায্যে বিশ্বের ব্যাখ্যা করতে চায়। তা

২ Positive Philosophy.

৩ Theological State.

যুক্তি দ্বারা সমর্থিত নয়। দ্বিতীয় হল দার্শনিক চিন্তার অবস্থা।[৪] এই অবস্থায় বিশ্বের ব্যাখ্যার চেষ্টা হয় বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কতক গুলি বিমূর্ত শক্তির সাহায্যে।[৫] এটিও তাঁর বিবেচনায় সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নয়। এই সব তত্ত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। তৃতীয় অবস্থা হল নৈশ্চিত্তিক অবস্থা। এখানে বিজ্ঞানের সাহায্যে কার্যকারণ সম্বন্ধে বিশ্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। তার মধ্যেই নিশ্চিত, নির্ভরযোগ্য জ্ঞান পাওয়া যায়। এই অবস্থায় মন-নিরপেক্ষ শক্তির কল্পনাকে ভিত্তি ক'রে বিশ্বের ব্যাখ্যার চেষ্টা না ক'রে, বা বিশ্বের উৎপত্তি কি ক'রে হল বা তার পরিণাম কি হবে—এই ধরনের সমাধানের অসাধ্য প্রশ্নের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে দৃশ্যমান জগতের কার্যকারণে সম্বন্ধ প্রাকৃতিক নিয়মগুলির অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করে।[৬] এই তৃতীয় পথেই নিশ্চিত এবং নির্ভরযোগ্য জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা আছে। এই দৃষ্টিগুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত বলেই তিনি তাঁর দর্শনের নাম দিয়েছেন নৈশ্চিত্তিক দর্শন।

এই সিদ্ধান্ত কোঁত-কে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে হতাশ করেছিল। তিনি তাঁর অস্তিত্বের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পান নি। সে ক্ষেত্রে ভক্তি ও সেবা গ্রহণের জন্য ঈশ্বরের পরিবর্তে তিনি কাকে নির্বাচন করবেন? ঈশ্বরের শূন্য আসনে কাকে স্থাপন করবেন এই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সমস্যা। তিনি তার সমাধান করেছিলেন সে আসনে মানুষকে বসিয়ে। বিশ্বের সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকেই তিনি ঈশ্বরের আসনে বসাতে চেয়েছিলেন। বিশ্ব-

৪ Metaphysical State.

৫ Abstract forces.

৬ 'In the final, the positive state, the mind has given over the vain search of the Absolute motions, the origin and destination of the universe and causes of phenomena and applies itself to the study of their laws.'

The Positive Philosophy.

মানবকে তিনি অভিবাদন জানিয়েছিলেন 'মহাসত্তা'[৭] বলে। এখন ধর্ম আচরণের দুটি অঙ্গ। একটি হল ঈশ্বরকে সেবা করা, আর দ্বিতীয়টি হল তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করা। কোঁত বিশ্বমানবকে সেবার পাত্র হিসাবে গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন আর ভক্তি নিবেদনের জন্য বিশিষ্ট মানুষদের নির্বাচিত করতে বলেছিলেন। যাঁরা মানবের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ ক'রে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই অভিনব ধর্ম আচরণের রীতি মানুষকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে বলে তিনি তার নাম দিয়েছিলেন মানবিক ধর্ম।[৮] সুতরাং এই ধর্মের মূল নীতি হল ঈশ্বরের পরিবর্তে মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ঈশ্বরের সেবার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের কল্যাণ-সাধনে আত্মনিয়োগ।

প্রাচীন ভারতের চিন্তায় এই পথে সুস্পষ্ট আলোচনা পরিস্ফুট না হলেও দেখা যায় যে তার অনুরূপ প্রকৃতির চিন্তা প্রাচীন কাল হতেই এ দেশে বর্তমান ছিল। অর্থাৎ বীজের আকারে এই চিন্তার প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উপস্থিতি আবিস্কার করা যায়। আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে দুএকটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে স্থাপন করা যেতে পারে। ঈশ উপনিষদ আরম্ভ হয়েছে এমন একটি বাণী দিয়ে যা এই ধরনের চিন্তার পরিপোষক তাতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে কাউকে বঞ্চিত ক'রে ভোগ করবে না যা পাবে তা ভাগ ক'রে ভোগ করবে। তার যুক্তি হিসাবে এই তত্ত্বটি উল্লেখ করা হয়েছে যে সকলেইত একই ঈশ্বরের প্রকাশ।[৯] অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের এমন একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে যা একই পরিবারের

৭ Grand etre.

৮ Religion of Humanity.

৯ ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিং চ জগত্যাং জগৎ॥ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা॥ ঈশ ॥১

মানুষের মত তাদের পরস্পরের আপনজন ক'রে দেয়। সে ক্ষেত্রে কাউকে বঞ্চিত করলে আপনজনকেই বঞ্চিত করবার সমস্থানীয় হবে।

কাজেই এখানে এমন একটি তত্ত্ব পাই যার মধ্যে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এখানে সর্বজনীন মানবিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পরোক্ষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ তার প্রেরণা আসছে ধর্মবোধ হতে। তা বলে সকল মানুষ যে একই ব্রহ্মের প্রকাশ। এখানেই পাশ্চাত্য মানবিকতার সহিত ভারতীয় মানবিকতার পার্থক্য। ভারতীয় মানবিকতা ধর্মবোধ হতে বিচ্ছিন্ন হয় নি, পাশ্চাত্য মানবিকতা ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

পরবর্তী কালের ভারতীয় সাহিত্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে দু একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। মনুসংহিতায় গৃহীকে পাঁচশ্রেণীর যজ্ঞ সম্পাদন করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে : দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং পশুযজ্ঞ।[১০] এখানে নৃযজ্ঞের অর্থ হল মানুষের সেবা করা। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ মূলক কাজ ধর্মাচরণের অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়েছে। এই দৃষ্টি-ভঙ্গি শুধু সাহিত্য কেন, সাধারণ মানুষের চিন্তায়ও অনুপ্রবেশ করেছিল। সাধারণ মানুষকে তারা নরনারায়ণ বলে জানে। অর্থাৎ তাদের মনে এই সংস্কার বর্তমান যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে। গরীব মানুষকে দরিদ্রনারায়ণ বলা হয়, তাও জানে। অবহেলিত মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে। গরীব মানুষকে দরিদ্রনারায়ণ বলা হয়, তাও জানে। অবহেলিত মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ সে সংস্কারও তাদের মধ্যে বর্তমান।

১০ ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥ মনু ॥৪॥২১

আধুনিক কালের মানবিকতায় যে দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্নিহিত তার প্রতিধ্বনি এই সচরাচর ব্যবহৃত কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের সেবা যে ঈশ্বর সেবার সমস্থানীয় এই ধারণা এ চিন্তায় প্রতিফলিত।

এমন কি যেখানে ঈশ্বর সেবার পরিবর্তে মানুষের সেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে সেখানেও ঈশ্বরকে একেবারে অবহেলা ক'রে বর্জন করা হয় নি। যাঁর ঐশ্বর্যের অন্ত নেই তাঁকে দেওয়া নিরর্থক এই ধরনের চিন্তাই সেখানে ক্রিয়াশীল। এর সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় নারায়ণ পণ্ডিত রচিত হিতোপদেশে উদ্ধৃত একটি শ্লোক হতে। তা বলে ঈশ্বরকে ধনদান করার কোনো অর্থ হয় না, ধন দিতে হয় দরিদ্রকে। কারণ ঈশ্বরের তো কোনো অর্থের প্রয়োজন নেই, তাঁর প্রচুর আছে। যে রোগী তাকেইত ঔষধ খাওয়াতে হয়, যে নীরোগ তার ঔষধ সেবনের কোনো অর্থ হয় না।[১১]

এই হল দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবিকতা। কোঁত স্থাপিত মানবিকতা হতে তার দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। তাঁর দর্শন গড়ে উঠেছিল একটি হতাশার মনোভাব হতে। তিনি ধর্মের ওপর এবং তথা দর্শনের ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন এই ধারণায় যে তারা নিশ্চিত জ্ঞান দিতে অক্ষম। কাজেই মৌলিক সত্তার প্রকৃতি কি সে সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য ধারণা তারা দিতে পারে না। সেই কারণেই তিনি কেবল বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর ক'রে একটি দর্শন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারি সেই মানুষকেই ঈশ্বরের আসনে বসানো হয়েছিল এবং ঈশ্বরের উপাসনার পরিবর্তে মহামানবকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সর্ব মানবের সেবাকেই ধর্মাচরণের প্রকৃত রীতি বলে গ্রহণ করা হয়েছিল।

১১ দরিদ্রান্ ভজ কৌন্তেয় মা যচ্ছেশ্বরে ধনম্।
রোগিনঃ পথ্যমৌষধং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥—হিতোপদেশম্।

অপরপক্ষে ভারতীয় চিন্তাধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়েছিল। তা দর্শনের জ্ঞান অর্জনের শক্তির ওপর বিশ্বাস হারায় নি। দ্বৈতবাদীর ঈশ্বর রূপেই হ'ক বা সর্বব্যাপী ব্রহ্ম রূপেই হ'ক এক মৌলিক সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস তার অক্ষুণ্ণ ছিল। ঈশ্বরকে স্বীকার করেই তার মানবিকতা গড়ে উঠেছিল। এই চিন্তায় ধর্মের অঙ্গ হিসাবেই মানবকল্যাণের ব্রত গ্রহণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কারণ তার ধারণা মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। কাজেই মানুষের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

২

রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত মানবিকতা এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। অর্থাৎ তা ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই তা গড়ে উঠেছে। এই বিশ্বাস খানিকটা তাঁর পারিবারিক পরিবেশ খানিকটা তাঁর নিজস্ব মতিগতি দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাঁর শৈশব এবং কৈশোরে তাঁর পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে একটি নতুন ধর্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। পরিবারের সকল মানুষ গভীরভাবে ধর্মে অনুপ্রাণিত ছিল। তার প্রভাব নিশ্চয় তাঁর ওপর বিস্তারিত হয়েছিল। অতিরিক্ত ভাবে তাঁর নিজের মধ্যে যেমন মনীষা তেমন হৃদয়বৃত্তির অনন্যসাধারণ বিকাশ ঘটেছিল। কাজেই স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগ ক'রে নিজের মতিগতির পথে তিনি ঈশ্বরকে নিজস্ব রীতিতে ভক্তি করতে শিখেছিলেন।

প্রথমে তাঁর পারিবারিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ঐকান্তিক ভাবে ঈশ্বরের ভক্ত। তিনি বাল্যে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সন্নিধি লাভ করেছিলেন এবং তাঁর পরলোক গমনের পর সদ্য স্থাপিত ব্রাহ্ম সমাজের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে এই সমাজ একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে সেকালের প্রায় সকল গুণী মানুষের শ্রদ্ধা

আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ভ্রাতৃগণ এই নতুন ধর্মকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তাঁদের বাড়ী ও পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে একটি শক্তিমান ধর্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই ধর্মের পরিবেশ যে তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সময় তিনি যে ব্রহ্মসংগীতগুলি রচনা করেছিলেন তার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সময় রচিত তাঁর একটি ব্রহ্মসংগীত তাঁর পিতাকে এমন মুগ্ধ করেছিল যে তিনি তখন কবিকে আর্থিক পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন।

আর এখানেই এ বিষয়টি পরিষ্কার ক'রে নেওয়া উচিত যে এ বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তা ও মতিগতিই তাঁর নিজস্ব ধর্মমতটিকে গড়ে তুলেছিল। পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব সম্ভবতঃ তাঁর ধর্মপ্রবণতাকে পরিবর্ধিত করার মধ্যে সীমিত ছিল। তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন তিনি স্বাধীন পথে নিজের ধর্মচিন্তার চর্চা ক'রে গেছেন। তিনি বলেছেন—'আমাদের পরিবারের যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।'[১২] ঠিক বলতে কি তাঁর স্বাধীন চিন্তার প্রতি আকর্ষণ এ পথে তাঁকে যেতে দেয় নি। বহির্বিশ্ব হতে যে বার্তা আসে তাকে গ্রহণ করবার জন্য তিনি মনের দরজা সব সময় খোলা রাখতেন। তাঁর গভীর মনীষা তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে ক্ষমতা রাখত। তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদনশীল মন বহির্জগতের সকল আহ্বানে সাড়া দিতে পারত। পায়ের তলায় দলিত সামান্য তৃণখণ্ড যেমন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করত, তেমন সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরীর আহ্বানেও তিনি সাড়া দিতেন। তাঁর মনের ব্যাপক গ্রহণশক্তি নানা বিপরীতধর্মী বিষয়কে এক নজরে দেখে নেবার ক্ষমতা রাখত। তিনি একই সাথে আকাশ ভরা সূর্যতারা এবং বিশ্বভরা প্রাণের মিলিত বিস্ময়কে যুগপৎ বক্ষে অনুভব করতে পারতেন।

[১২] জীবনস্মৃতি, ভগ্নহৃদয়

তাঁর তীক্ষ্ণ ধীশক্তি নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করতে আনন্দ পেত। এই ভাবে তার ধীশক্তি এবং প্রখর অনুভূতিশক্তি এবং সর্বোপরি ঐকান্তিক বিস্ময়বোধ তাঁকে ধর্মতত্ত্ব এবং দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

কাজেই এটা দেখে বিস্মিত হবার কোনো কারণ নেই যে তাঁর রচনার এক বিরাট অংশ জ্ঞানজগতের এই মৌলিক প্রশ্নগুলির সহিত জড়িত হয়ে পড়েছে। তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলি ছাড়া বোধহয় তাঁর সকল রচনাই অল্পবিস্তর দার্শনিক ও ধর্মসম্পর্কিত চিন্তার সহিত জড়িত হয়ে পড়েছে। তাঁর কবিতার ত কথাই নেই, এমন কি তাঁর নাট্যগুলিতে তার প্রভাব সুস্পষ্ট। মনে হয় এর ফলে তাঁর রচনায় একটি একটি গতিশীলতাগুণ সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর ধর্মসম্পর্কিত চিন্তা ধীরে ধীরে তাঁর মনের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে। ঠিক বলতে কি তাঁর ধর্মচিন্তার পরিণত রূপটি তাঁর আজীবন সাধনার ফল। তরুণ বয়সেই তার সূত্রপাত এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তা পরিণতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। এই পথে তাঁর চিন্তা গতিশীল।

এই অবস্থা হতে একটা সুবিধা এসে পড়ে। তাঁর রচনায় তাঁর চিন্তাগুলি প্রতিফলিত থাকায় তাদের মধ্য হতে আহরণ ক'রে তাঁর ধর্মসম্পর্কিত চিন্তা যে পথে বিকাশ লাভ করেছে তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সম্ভবত গড়ে তোলা যায়। তাঁর রচনার সাহায্যেই তাঁর মনের চিন্তাধারার যে পরিচয় পাওয়া যায় এ বিষয় মনে হয় তিনি নিজেও অবহিত ছিলেন। তাঁর একটি মন্তব্য হতে আমাদের এই প্রতিপাদ্য সমর্থিত হবে। মন্তব্যটি ইংরাজিতে লিখিত। সুতরাং তার বাংলা অনুবাদ নীচে উদ্ধৃত হল:

'শুধু দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে নয় একটি ধর্ম-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা রূপেও মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে চেতনা আমার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে-

১৩ *The Religion of Man, Preface*

ছিল। ঠিক বলতে কি আমার অপরিণত তরুণ বয়সের প্রথম রচনা হতে আরম্ভ ক'রে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমার লেখার একটি বিরাট অংশ এই বিকাশের ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক পরিচয় দেয়।'[১৩]

একটু আগেই বলা হয়েছে যে তাঁর ধর্মসম্পর্কিত তথা দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস অলক্ষিতভাবে তাঁর কথাসাহিত্য ব্যতীত অন্য সকল প্রকার সাহিত্যেই অল্পবিস্তর লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। মনে হয় তাঁর কবিতাগুলি সম্পর্কে এই কথা আরও বেশী খাটে। তার কারণ সহজেই ধরা যায়। তিনি স্বভাবত কবি ছিলেন। কবির চিন্তা সাধারণ দার্শনিকের মতো নীরস যুক্তির পথে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে সংঘটিত হয় না। তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ কবি। বুদ্ধিবৃত্তি হতে তাঁর হৃদয়বৃত্তি ছিল প্রবলতর শক্তি। তিনি যা ভাবতেন তার প্রকাশ ঘটত অনুভূতি আকারে এবং এই অনুভূতিই তাঁর কবিতাগুলির প্রেরণা হয়ে তাঁর রচনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করত। তাই তাঁর কবিতার মধ্যে তাঁর সাধনজীবনের ইতিহাস অতি স্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে যায়। এই কারণে কি ভাবে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর ধর্ম-সম্পর্কিত চিন্তা পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছিল তাঁর কবিতার মধ্যেই তার একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অন্য রচনায় তার সামগ্রিক রূপটি এমন ভাবে ধরা পড়ে না, তবে তার সমর্থন পাওয়া যায়। অবশ্য আমাদের এই মন্তব্য হতে এমন ধারণা করা ঠিক হবে না, যে তাঁর কবিতা কেবল ধর্ম-সম্পর্কিত বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্বের এমন জিনিস নেই যার আবেদনে তাঁর সংবেদনশীল মন সাড়া দিত না। তা বহু বিচিত্র পথে প্রবাহিত। আমাদের মন্তব্যের অর্থ এই যে তাঁর কবিতার মূল স্রোতটি প্রবাহিত হয়েছিল তাঁর সাধনজীবনের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে।

এই প্রসঙ্গে তাঁর এই শ্রেণীর কবিতা সম্বন্ধে আর একটি অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই শ্রেণীর কবিতাগুলির চিন্তা এবং অনুভূতি একটি

মূল বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েছে। তা হ'ল ঈশ্বরের প্রীতিকে ভিত্তি ক'রে তাঁর সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের আকুতি। তরুণ জীবনেই এই ভাবটি তাঁর মনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে বসেছিল এবং পরবর্তীকালে তাঁর সমগ্র জীবনকে ব্যাপ্ত ক'রে ধীরে ধীরে বিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই মূল ভাবটির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে তাঁর প্রথম জীবনে রচিত প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা-গুলির মধ্যে। তখন তিনি প্রকৃতির মধ্যে এক সর্বব্যাপী সত্তার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অনুভব করেছিলেন এবং তার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আকুতি মনে অনুভব করেছিলেন। তাঁর মধ্য জীবনের কবিতায় জীবনদেবতা রূপে কল্পিত এক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বরের সহিত মিলনের আকুতি তাঁর কবিতার মূল প্রেরণার ভূমিকা অধিকার করেছিল। পরিণত বয়সে তাঁর কবিতায় যে উপলব্ধিটি পরিস্ফুট হয়েছিল তা বলে মানুষকে প্রীতি ক'রে এবং সেবা ক'রেই এই মৌলিক আকুতির সর্বাত্মক তৃপ্তিসম্পাদন সম্ভব। মৌলিক সত্তার প্রতি আকর্ষণ এবং তার সহিত প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের ঐকান্তিক ইচ্ছাই এই ভাবে তাঁর মনে একটি স্থায়ী আকুতির রূপ নিয়ে আজীবন ক্রিয়াশীল ছিল। বিভিন্ন অবস্থায় প্রীতি ও সেবার পাত্রের পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু লক্ষ্য একই রয়ে গেছে। তাঁর প্রীতির আস্পদ রূপে যিনি গৃহীত হয়েছিলেন তিনি প্রথমে ছিলেন এক নৈর্ব্যক্তিক প্রচ্ছন্ন শক্তি, পরে তাঁর স্থান অধিকার করেছিলেন ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বর এবং পরিণত জীবনে তাঁদেরই প্রকাশ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন বিশ্বমানবের মধ্যে। এই ভাবেই তাঁর সাধনজীবনে তাঁর নিজস্ব মানবিকতা তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল।

এই কারণে তাঁর কাব্য একটি অনন্যসাধারণগুণে মণ্ডিত হয়েছে, কাব্যই তাঁর সাধনজীবনের ইতিহাস রচনা করেছে। তার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে প্রথমত আমাদের এই সুবিধা হয়েছে যে তাঁর কবিতার মধ্যে একটি ধারাবাহিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। খুব কম কবির কবিতায় এমন গুণ দেখা যায়। তাঁর মূল চিন্তা বা ভাবনাটি যেমন

বিকাশ লাভ করেছে তেমন তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে তাঁর কাব্য শুধু গতিশীল হয় নি, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ তাঁর কবিতা বিকাশধর্মী হয়েছে।

দ্বিতীয়ত আনুষঙ্গিক ভাবে তাঁর কাব্য সাধনজীবনে-লব্ধ অভিজ্ঞতার বাহনের ভূমিকা গ্রহণ করায় তার মধ্যে তাঁর কাব্যের সঙ্গে তার ধর্ম-সম্পর্কিত চিন্তার মিলন সংঘটিত হয়েছে। তাঁর কাব্য হতেই তাঁর ধর্ম-সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তার একটি ধারাবাহিক পরিচয় মিলে যায়। তাঁর কাব্য এবং তাঁর সাধনা এইভাবে পাশাপাশি হাত ধরাধরি ক'রে সমান্তরাল পথে অগ্রসর হয়েছে। এটি প্রথম জীবনে তাঁর অজ্ঞাতে ঘটেছিল, তবে পরবর্তী জীবনে তিনি সে বিষয় সচেতন হয়েছিলেন। এ বিষয়টিকে তিনি তাঁর নিজস্ব মনোহর ভাষায় একটি রূপক প্রয়োগ ক'রে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর কাব্যজীবন এবং সাধনজীবন দীর্ঘকাল তাঁর অজানিতে পরস্পর বাগদত্ত হয়েছিল এবং পরে উদ্বাহ বন্ধনে উভয়ে মিলিত হয়েছিল।[১৪]

কাজেই এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ এবং কবি রবীন্দ্রনাথ হাতে হাত মিলিয়ে এক সঙ্গে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তার লক্ষ্যবস্তু হল মানুষের ধর্ম-সমস্যার একটি সন্তোষজনক সমাধান খুঁজে বার করা। যে মূল প্রশ্নটি তাঁর মনের দরজায় সমাধানের জন্য আবেদন জানাচ্ছিল তা হল মানুষের আদর্শ ধর্মাচরণ রীতি কেমন হওয়া উচিত। এই প্রশ্নের উত্তরের অন্বেষণেই তিনি নিজস্ব মানবিকতা তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। সুতরাং এই অন্বেষণের ইতিহাসই আমাদের মূল আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তার

১৪. 'My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetical life. Some how they are wedded to each other and though their bitrothal had a long period of are many it was kept secret to me.' *The Religion of Man, Preface.*

আগে আরও কিছু প্রাথমিক কথা বলে নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়বে। আমাদের বুঝে নিতে হবে ধর্ম-সম্পর্কিত সমস্যা বলতে কি বুঝি এবং কি পরিবেশে তার উদ্ভব ঘটে, ঈশ্বরকে শ্রদ্ধানিবেদনের ইচ্ছা কেন একটি সর্বজনীন আকুতি হিসাবে মানুষের জীবনে আত্মপ্রকাশ করে।

৩

একটি মহত্তর শক্তির নিকট শ্রদ্ধানিবেদনের আকুতিই হল মানুষের ধর্মবোধ। মানুষের মনের মধ্যে যেমন একটি শিল্পবোধ আছে যা শিল্প সৃষ্টি করে বা শিল্পের রসগ্রহণ ক'রে তৃপ্তি পায়, ধর্মবোধও তেমন মানুষের মনের মধ্যে প্রোথিত একটি প্রবল আকুতি। এই ধর্মবোধ গড়ে ওঠে মানুষের মনের দুটি মৌলিক বৃত্তির পারস্পরিক প্রভাবের ফলে। তারা হল বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি। ইতর জীবের মধ্যে ধর্মবোধ নেই, কারণ মানুষের মত তাদের বুদ্ধিশক্তি বা অনুভূতিশক্তি তেমন প্রবল নয়। তারা অতি সীমিত জীবন যাপন করে। পরিবেশ হতে পুষ্টির জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা এবং তার প্রতিকূলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে আত্মরক্ষা করা নিয়েই তাদের জীবন সীমাবদ্ধ। তাদের অনেক মৌলিক সমস্যার সমাধান প্রকৃতিই তাদের মনের মধ্যে গ্রথিত বৃত্তির[১৫] মাধ্যমে নিষ্পন্ন করে দেয়। কখন বাসা বাঁধতে হবে, কখন দল বেঁধে দেশান্তরে যেতে হবে ইত্যাদি কাজ সেই বৃত্তির নির্দেশেই সম্পাদিত হয়। কাজেই তাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাদের হৃদয়বৃত্তিও অনুরূপ কারণে ভালো বিকাশ লাভ করবার সুযোগ পায় না। তাদের শৈশব মানুষের মত দীর্ঘকাল স্থায়ী নয়। অতি দ্রুত তারা স্বাবলম্বী হবার ক্ষমতা অর্জন করে। তাদের নাতিদীর্ঘ শৈশবে তাদের মায়ের যেটুকু পরিচর্যার প্রয়োজন তাও অনেকখানি বৃত্তির নির্দেশে সম্পাদিত হয়। মানুষের মনে যে গভীর প্রীতি করবার ক্ষমতা বর্তমান তার সহিত তাদের কোনো পরিচয় নেই।

১৫ Instinct

মানুষের অবস্থাটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তার গভীর ধীশক্তি তাকে বহির্বিশ্বে ক্রিয়াশীল এক বিরাট এবং ব্যাপক মহাশক্তির উপস্থিতির সহিত পরিচিত করে। সেই ব্যাপক সত্তার বিস্তার তার কল্পনাশক্তিকে হার মানায়। প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত শৃঙ্খলা এবং নিয়মিত ক্রিয়াপ্রবাহ তার গভীর ধীশক্তির পরিচয় দেয়। তার শক্তির বিশালত্ব দেখে সে অভিভূত বোধ করে। এই সব অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের মনে এই বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে একটি মহত্তর শক্তি বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছেন।

এই বিরাট শক্তির পাশে মানুষ নিজেকে নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করে। ফলে ভয় ও শ্রদ্ধার একটি মিশ্র অনুভূতি তার মনে ফুটে ওঠে। আশ্রয়ের জন্য ও বিপদ হতে ত্রাণের জন্য সে তার ওপর নির্ভরশীল হতে শেখে। ধর্মের আদিম রূপটির এই ভাবে জন্ম সংঘটিত হয়। এই অবস্থায় শ্রদ্ধা হতে ভয়ের ভাবটাই প্রবল। ধীরে ধীরে মানুষের মনে শ্রদ্ধার ভাবটি প্রবলতর হয়ে ওঠে। যে শক্তির মধ্যে বিশ্ব বিবৃত তা ত শুধু ভয়ঙ্কর নয় কল্যাণকরও বটে। এই উপলব্ধির ফলে মানুষের মনে সেই মহৎশক্তির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের একটি আকুতির জন্ম হয়। তখন সময় আসে অনুভূতিবৃত্তির নিজস্ব ভূমিকাটি গ্রহণ করবার। কি ভাবে কোন রীতিতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হওয়া উচিত সেই প্রশ্নের তখন উদ্ভব হয়। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ধর্মসমস্যার জটিলতা গড়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নিজস্ব মতিগতির পথে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। একাধারে যেমন প্রখর ধীশক্তির তেমন সংবেদনশীল অনুভূতিশক্তিরও তিনি অধিকারী ছিলেন। কাজেই গভীর ভাবে তিনি এই সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অপর পক্ষে তিনি নিজের মতিগতির পথে স্বাধীন চিন্তা ও উপলব্ধির সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন। গতানুগতিক পথে তিনি চলতে চান নি। এই কারণে তাঁর চিন্তা সর্বতোভাবে মৌলিকত্ব গুণের অধিকারী হয়েছে।

অপর পক্ষে তিনি মূলত কবি হওয়ায় কেবল বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগে বিশ্বসভার সহিত পরিচয়ে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নি। হৃদয়বৃত্তির সাহায্যে নিবিড় অনুভূতির মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে মানুষ যে পথে বিশ্বসত্তার সহিত পরিচিত হন সে পথ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হৃদয়বৃত্তির সাহায্যে তাঁকে প্রেমাস্পদ রূপে পেতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর ধর্ম-সম্পর্কিত দার্শনিক চিন্তা একটি অনন্যসাধারণ ও অভিনব রূপ ধারণ করেছে।

৩

ঠিক বলতে কি ধর্মের পথ অনুভূতির পথ। তা হৃদয়বৃত্তির সাহায্যে বিশ্বসত্তার সহিত সংযোগ স্থাপন করতে চায়। প্রায় সকল প্রচলিত ধর্মই এই পথ গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথও মূলত এই পথেই ধর্মসমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন। কিন্তু তাঁর গতিশীল মন একটি অবস্থায় লব্ধ একটি বিশেষ চিন্তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় নি। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূতন পথে চিন্তা ক'রে তিনি মতের পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করলে তা করতে দ্বিধা করেন নি। এই ভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে গিয়ে তাঁর ধর্মচিন্তার পরিণত রূপটির আবির্ভাব হয়েছে। খোলা মন নিয়ে তাঁর সাধনজীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি ক'রে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই কারণে তাঁর ধর্ম-সমস্যা সম্পর্কিত চিন্তা শুধু অভিনব হয় নি মৌলিকত্ব গুণে ভূষিত হয়েছে।

মনে হয় তাঁর ধর্মসম্পর্কিত চিন্তা দুটি ধারণা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এখানে তাদের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। তাতে আমাদের মৌলিক আলোচনায় প্রবেশ করতে সুবিধা হবে। তাদের প্রথমটি হল তাঁর নিজের মতিগতি। এ বিষয় প্রসঙ্গত ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশ্বসত্তার সহিত পরিচয়ের মান কি হওয়া উচিত সে বিষয় তাঁর চিন্তা খুব সুস্পষ্ট ছিল। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল জ্ঞানমার্গে যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান মৌলিক সত্তার প্রকৃত পরিচয় এনে

দিতে অক্ষম। তা যে পরিচয় এনে দেয় তা নিতান্তই বাহিরের পরিচয়, তা গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। অপর পক্ষে মৌলিক সত্তার ঘনিষ্ঠতর পরিচয় মেলে প্রীতির পথে। তাঁর ধারণায় ঈশ্বরের সহিত প্রীতির সমুদ্রের ভিতর দিয়ে তাঁর গভীরতর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমটি জ্ঞানমার্গ, বুদ্ধিবৃত্তি তার অবলম্বন। দ্বিতীয়টিকে প্রীতিমার্গ বলতে পারি, হৃদয়বৃত্তি তার অবলম্বন। স্পষ্টতই দ্বিতীয়টির প্রতি তাঁর পক্ষপাত বেশী।

তাঁর প্রতিপাদ্যকে সহজবোধ্য করবার জন্য তিনি একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন একজন চিকিৎসক এবং তাঁর পুত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক তার উপর এই দুই মার্গেরই প্রয়োগ সম্ভব। ধরা যাক তাঁর পুত্রের অসুখ করেছে। তখন তিনি তার চিকিৎসার জন্য তাকে চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মতভাবে পরীক্ষা করবেন। এখানে তিনি তাঁর পুত্র সম্পর্কে জ্ঞানমার্গের প্রয়োগ করছেন। অপর পক্ষে তিনি তাঁর পুত্রের জন্য যে গভীর স্নেহ বহন করেন সন্তানের রোগ যন্ত্রণা তাকে উদ্বেলিত করলে তিনি তাকে উচ্ছ্বাস ভরে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং সন্তানও তাতে সাড়া দেয়। এই প্রীতির বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তিনি সন্তান সম্বন্ধে যে জ্ঞান আহরণ করেন তা আরও গভীর পরিচয় দেয়। এখানে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সাক্ষাৎ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬] যুক্তির ভিত্তিতে বিজ্ঞানের রীতিতে যা পাই তিনি তাকে তাই জানা বলেছেন; আর হৃদয়বৃত্তির প্রয়োগে প্রীতির সম্বন্ধে যা পাই তাকে তিনি পাওয়া বলেছেন।

দ্বিতীয় যে জিনিসটি তাঁর ধর্ম সংস্থার সমাধানে প্রযুক্ত সিদ্ধান্তটিকে প্রভাবান্বিত করেছে তা হ'ল তাঁর নিজের স্থাপিত ধর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব

১৬ 'The Scientific Knowledge of his son is information about a fact and not the realisation of a tiuth—the truth of relationship, the truth of a harmony in the universe, the fundamental principles of creation.

The Religion of Man, The Vision

আদর্শ। সে আদর্শটি একান্তই মৌলিক। তাঁর ধারণায় আদর্শ ধর্ম হওয়া উচিত তাই যা মানুষের সকল মৌলিক বৃত্তিগুলির সমানভাবে পরিবর্ধনে সহায়তা ক'রে মানুষকে পরিপূর্ণ মানবত্বের অধিকারী করবে।

এখন মানুষ হল একটি জটিল সত্তা। তার নানাবৃত্তি, নানা আকুতি। প্রথমত তার বুদ্ধিবৃত্তি একটি মৌলিক বৃত্তি। তাকে অবলম্বন ক'রে বিশ্বরহস্যকে ভেদ করবার একটি আকুতি তার মনের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তা হতেই তার জ্ঞানপিপাসার উৎপত্তি। তার হৃদয়বৃত্তি আছে এবং তাকে অবলম্বন ক'রে অন্যকে প্রীতি করবার এবং প্রীতি পাবার আকাঙ্ক্ষা তার মনে জাগে তৃতীয়ত তার একটি ইচ্ছাবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্মে আকুতি আছে। এই ভাবে তার তিনটি মৌলিক বৃত্তি তার মনে তিনটি শক্তিশালী আকুতি প্রোথিত ক'রে দেয়। এই বিভিন্ন আকুতিই মানুষকে তার জীবন পথে এগিয়ে নিয়ে চলে।

কাজেই ধর্মের ক্ষেত্রেও তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। তাদের প্রভাবেই বিভিন্ন ধর্মাচরণের রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। যার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল সে জ্ঞানমার্গে মূল সত্তার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসাহী হবে। যে মানুষের হৃদয়বৃত্তি প্রবল সে ঈশ্বরের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ ক'রে তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইবে। গীতায় এই দুই শ্রেণীর মানুষকেই ভক্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রথমটিকে জিজ্ঞাসু এবং দ্বিতীয়টিকে ভক্ত বা জ্ঞানী বলা হয়েছে।[১৭] আবার যার ইচ্ছাশক্তি প্রবল হওয়ায় কর্মে আকর্ষণ বেশী সে এমন রীতি খোঁজে যেখানে কর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা করা সম্ভব হয়। এই শ্রেণীর মানুষই অনেক সময় সমাজসেবক হয়। এই মনোবৃত্তির প্রেরণা হতেই মানবিকতার উৎপত্তি। অনেক ক্ষেত্রে সেবাবৃত্তির ও ধর্মের উপর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক হিন্দুধর্মে ঈশ্বরকে

১৭ চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতি নোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ —গীতা ৭।১৬

বিগ্রহরূপে কল্পনা ক'রে তাঁর সেবার জন্য যে নানা আনুষ্ঠানিক রীতি গড়ে উঠেছে তা এর সুন্দর দৃষ্টান্ত।

এই ভাবে মতিগতির প্রভাবে ধর্মাচরণ রীতি নানারূপ গ্রহণ ক'রে জটিল আকার ধারণ করে। এই পরিবেশে প্রশ্ন ওঠে এত যে বিভিন্ন রীতি তাদের কোনটি গ্রহণ করব। এটার মীমাংসা এ পর্যন্ত হয়ে এসেছে দুই পথে। এক পথ হল যেটি ভালো মনে হল সেটিকে গ্রহণ করা এবং পণ্যগুলিকে তুলনায় নিকৃষ্টজ্ঞানে পরিহার করা। আমাদের দেশে এর সুন্দর উদাহরণ মেলে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম আন্দোলনে। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম তখন বিগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে নানা আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরে নিজেকে জটিল ক'রে তুলেছে। এদিকে যারা বাণিজ্য করতে এসে আমাদের মনিব হয়ে বসল তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিরাকার উপাসনা রীতি নব্য ইংরাজি শিক্ষিতদের মনে এক ভিন্ন রীতির ধর্মের আস্বাদ এনে দিল। তারা তখন হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিকতা দুষ্ট বলে প্রত্যাখ্যান করল। তাদের অনেকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হল। আর একদল মানুষ অনুরূপ রুচি পোষণ ক'রে ও রাজা রামমোহন রায়ের স্থাপিত জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক নূতন নিরাকার উপাসনা রীতি গ্রহণ করল। এই ভাবেই ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ঘটেছিল।

আর এক পথেও এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। তা হল সমন্বয়ের পথ। সমন্বয় বলতে সাধারণত যা বুঝি এ তা নয়। দুটি ভিন্ন ধর্মীয় রীতির সমন্বয়ে একটি তৃতীয় রীতি গ্রহণের প্রস্তাব তা করে না। তা সংঘাতকে বর্জন করতে চেষ্টা করে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ক'রে সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তুলে। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরকে ভক্তি নিবেদনের যে আকুতি জাগে তার তৃপ্তি সাধনই তো মূল কথা। সে ক্ষেত্রে যার যে ভাবে তৃপ্তি হয় সেইটিই তার পথ। একই পথ সকলের উপর জোর ক'রে আরোপ করবার প্রয়োজন নেই। এই যুক্তিটি রামকৃষ্ণ ঠাকুরের বাণীর মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলতেন 'যত মত তত পথ'। মানুষের এ বিষয় রুচির ভিন্নতা

অনুসারে ধর্ম আচরণের নানা রীতি গড়ে উঠেছে। তাদের কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, সে প্রশ্ন অবান্তর। যে যেটা গ্রহণ করতে পারে তার পক্ষে সেটাই উপযুক্ত। মতিগতি, বুদ্ধিশক্তি, হৃদয়বৃত্তি, তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার—সব জড়িয়ে ঠিক ক'রে দেয় কোন মানুষের কোন রীতিতে অধিকার। অধিকাব ভেদে বিভিন্ন মানুষের গ্রহণযোগ্য রীতি বিভিন্ন হয়ে পড়ে। মূল সমস্যা হল ঈশ্বর তৃষ্ণা নিবারণ। তৃষ্ণা পেলে আমরা তো বিচার করি না ; কলের জল খাব, কি নদীর জল খাব, কি কূপের জল খাব। যার যেটা সুবিধা সে তাই পান করুক। গীতায়ও এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে যে মানুষ যে রীতিতে ঈশ্বরকে পেতে চায় সেই রীতিতেই তাঁকে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই দুটি পথের কোনোটিই গ্রহণ করেন নি। কারণ তাঁর আদর্শ ছিল বিভিন্ন। তিনি এ মত গ্রহণ করতে পারেন নি যে ঈশ্বরে ভক্তি প্রকাশই ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য। তা নিতান্তই সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাঁর আদর্শ ছিল আরও ব্যাপক। তাঁর মতে মানুষের ধর্ম হবে তাই যা মানুষের সমগ্র প্রকৃতিকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। ধর্মের প্রকৃত কাজ হবে তাব তিনটি মূলবৃত্তির —বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তির যুগপৎ সুসমঞ্জস পরিবর্ধন ঘটিয়ে মানুষকে পরিপূর্ণ মানব রূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করা। তাঁর মতে তাই হবে আদর্শ ধর্ম যা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা নিবেদনের আকৃতিকে এমন ভাবে ব্যবস্থা করবে যাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই তিনটি বৃত্তিরও যুগপৎ বিকাশ ঘটাবে। তিনি বলেছেন মানুষের ধর্ম হল তার মানবত্ব।[১৮] আদর্শ ধর্মের উদ্দেশ্য হবে সেই ধর্মকে বিকশিত করা।

এই পথেই তিনি নিজস্ব মতটিকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার ক'রে দেওয়া দরকার। ধর্ম অর্থে

১৮ 'And humanity is the *Dharma* of human beings' *The Religion of Man, Man's Nature*

তিনি কোনো প্রচলিত ধর্মরীতিকে গ্রহণ বা বর্জন করবার প্রশ্ন তোলেন নি। তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা ক'রে ধর্মের যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তার ভিত্তিতেই নিজস্ব ধর্মরীতি গড়ে তুলেছেন। তাকে তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্ম হিসাবে গড়ে তুলতে চান নি, তাকে তিনি বিশ্বের মানুষের ধর্মের আদর্শ হিসাবে স্থান দিতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে নানা ধর্মের অঙ্গ হিসাবে যে বিভিন্ন রীতি গড়ে উঠেছে তার কিছু কিছু তিনি অনুমোদন করতে পারেন নি, কারণ তিনি আদর্শ ধর্মের যে গুণ নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে সে গুণের তিনি অভাব লক্ষ্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাদের কয়েকটির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তার ফলে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আমাদের আরও নিবিড় পরিচয় ঘটবে।

তিনি দার্শনিক রীতি যে অনুমোদন করতে পারেন নি তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার দুটি কারণ ছিল। প্রথমত তা কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তিরই বিকাশ সাধন করে ; সুতরাং মানুষের সামগ্রিক পরিবর্ধনের সহায়তা করে না। দ্বিতীয়ত তা মৌলিক সত্তা সম্বন্ধে যে পরিচয় এনে দেয় তা নিতান্তই বাহিরের পরিচয়। কারণ তা জোড়া দিয়ে দিয়ে জাগে, এক সঙ্গে সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারে না। তাঁর ধারণা সমগ্রকে পাওয়া যায় হৃদয়বৃত্তির পথে প্রীতির সম্বন্ধে।

একই কারণে যে রীতি কেবল হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তি সাধনকে অতিবেশী মূল্য দেয় তাকেও তিনি অনুমোদন করতে পারেন নি। তারও দুটি কারণ আছে। প্রথমত তাও একটি মাত্র বৃত্তির বিকাশের সহায়ক। শুধু তাই নয়, ভক্তির উচ্ছ্বাসকে অত্যধিক প্রাধান্য দেবার ফলে এই রীতিতে অনেক সময় উন্মাদনা এসে পড়ে। আমাদের দেশে কীর্তন করতে করতে অনেকের উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে মোহপ্রাপ্তি ঘটে। এই ধরনের উপাসনা রীতির বিরুদ্ধে তিনি তাই এই ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন—

'যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীত গানে

ভাবোম্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞান হারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল প্রেম ভক্তি মদ ধারা
নাহি চাহি নাথ।'[১৯]

এই ধরনের ভক্তি রসাত্মক ধর্মের আরও এক রূপ পাওয়া যায় প্রতীকের সাহায্যে উপাসনায়। এখানে ঈশ্বরকে বিগ্রহরূপে পূজা করা হয়। এই ধরনের উপাসনাবৃত্তি ভাবপ্রাণ ব্যক্তির রুচির অনুকূল। বিগ্রহ সামনে থাকায় সুবিধা এই যে এখানে ভক্তি বা শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ঈশ্বরের একটি কল্পিত প্রকট প্রকাশ পাওয়া যায়। ফলে শ্রদ্ধানিবেদনের উপায়গুলিকেও স্থূল এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। উক্ত ঈশ্বরকে নাগালের মধ্যে পায় এবং তাঁকে সাজসজ্জায় ভূষিত ক'রে নানা ভাবে সেবা করবার সুযোগ পায়। এই কারণেই পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের এত আকর্ষণ।

কিন্তু যে আদর্শ-ধর্মাচরণের মানদণ্ড রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছেন তার পরীক্ষায় একেও উত্তীর্ণ করানো যায় না। তার কারণ প্রথম তা কেবল হৃদয়বৃত্তির বিকাশে সহায়তা করে। বিগ্রহ সেবার মধ্যে কর্মবৃত্তির প্রয়োগের কিছু সুযোগ ঘটে বটে কিন্তু তাও সার্থক হয় না, কেবল ভক্তি নিবেদনেই পর্যবসিত হয়। অতিরিক্ত ভাবে এতে খানিকটা মুগ্ধভাব আসে এবং আচার ও অনুষ্ঠানের বাহুল্যের মাঝখানে ভক্ত নিজেকে হারিয়ে ফেলে। যা গৌণ জিনিস তাই মুখ্য স্থান অধিকার ক'রে বসে। তা মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায়। তিনি তাই তার বিরুদ্ধে এইরূপ মন্তব্য করেছেন—

'মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারা বেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজা খেলা
মুগ্ধভাব ভোগে সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুত্তল।'[২০]

১৯ নৈবেদ্য
২০ নৈবেদ্য

এই ভাবে বিভিন্ন রীতির তিনি কোনোটিকেই গ্রহণ করতে না পেরে শেষে নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি নিজস্ব ধর্মবিষয়ক আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন। বলা বাহুল্য তা একটি বিশ্বজনীন আদর্শ। তবে তা হঠাৎ গড়ে ওঠে নি। ধীরে ধীরে তাঁর সমগ্র সাধনজীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি ক'রে তা গড়ে উঠেছিল। তা পরিণতির পথে এগিয়ে যেতে বিভিন্ন অবস্থায় এক সিদ্ধান্ত হতে অন্য সিদ্ধান্তে চলে গিয়েছিল। এই দীর্ঘ অভিযানের শেষে তিনি যে পরিণত আদর্শটি গড়ে তোলেন তার মধ্যেই তাঁর মানবিকতা প্রতিফলিত। আমরা এখন এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ইতিহাসটি ধারাবাহিক ভাবে স্থাপন করতে চেষ্টা করব।

৪

এই দীর্ঘ অভিযানের প্রথম অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনেই। প্রকৃতির সহিত নিবিড় সংযোগের আকুতিই তার প্রথম লক্ষণ। তিনি এ বিষয় অবহিত ছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর সাধনজীবনের প্রথম অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় প্রকৃতির সহিত নিবিড় পরিচয়ের মধ্য দিয়ে।[২১] শৈশবে প্রকৃতির প্রতি কি তীব্র আকর্ষণ তিনি অনুভব করতেন তা তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর পৈত্রিক গৃহ উত্তর কলিকাতার এক ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত হলেও তাঁর শৈশবে তা একেবারে প্রকৃতির সংস্পর্শ বিবর্জিত ছিল না। তার আশে পাশে অনেক খোলা জমি ছিল। মূল গৃহের পূর্বদিকে একটি প্রশস্ত উদ্যান ছিল। তার একেবারে পূর্বপ্রান্তে এক সারি নারিকেল গাছ মাথায় পাতার বাহার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। গৃহের দক্ষিণে একটি বড় দীঘি ছিল। তার কোণে একটি প্রাচীন বট মাথায় জটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। উত্তর-পশ্চিম

২১ 'The first stage of my realisation was through my feeling of intimacy with nature.' *Religion of Man, Mans' Universe*

দিকে যেখানে এখন বিচিত্রা ভবন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে এক প্রশস্ত খোলা মাঠ ছিল। সেখানে বাড়ীর ঘোড়াদের সহিসরা বেড়িয়ে নিয়ে বেড়াত।

বাড়ীর সংলগ্ন এই খোলা জায়গায় তৃণের সবুজ বিস্তার, গাছপালায় বাতাসের আন্দোলন এবং উদ্যানের ফুলের শোভা বাল্যে তাঁর বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। দীঘির জলে হাঁসের সাঁতার কাটা দেখতে তাঁর ভারি ভালো লাগত। পূর্ব সীমানায় সার বেঁধে যে নারিকেল গাছগুলি দাঁড়িয়ে থাকত তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ভোরের সূর্যের প্রথম কিরণে রঞ্জিত হয়ে তাদের মাথায় পাতার বেষ্টনী যখন বাতাসে আন্দোলিত হত তার শোভা তখন তাঁর মনকেও আন্দোলিত করত। এ সব কথাই তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ভোরের আকাশের আনন্দ উৎসবে যোগ দেবার নিমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে তিনি থাকতে পারবেন না। তাই দারুণ শীতেও প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ ক'রে প্রতিদিন বাগানে গিয়ে হাজির হতেন। মনে হয় তাঁর 'গীতিমাল্য'এর একটি কবিতায় এই অংশটি তাঁর বাল্যের স্মৃতিরই প্রতিধ্বনি—

'আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি
তাই ভোরে উঠেছি।

আজ শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী
তাই বাইরে ছুটেছি।'

তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে আরও উল্লেখ করেছেন যে, বাল্যে প্রকৃতির সহিত এই নিবিড় যোগ তাঁর মনে প্রচুর আনন্দ এনে দিত; কিন্তু প্রথম যৌবনে কবিতার আকর্ষণে তিনি যখন প্রথম নিজেকে ধরা দিলেন তখন প্রকৃতি হতে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। এই পরিবেশে নিজের মনগড়া বিষয়কে কল্পনায় রঞ্জিত ক'রে তিনি কবিতা রচনা করতে শুরু করলেন। ফলে তাঁর মনের মধ্যে নিজেই আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। এটি ছিল তাঁর প্রথম সার্থক কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'এর যুগ। তাই দেখি

তাঁর 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'এর কবিতাগুলিতে একটি বিষাদের মলিন ছায়া পড়েছে। তাঁর সেই সময়ের মানসিক অবস্থার একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় নীচে উদ্ধৃত তাঁর কবিতার এই অংশটিতে ঃ

'তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
গুমরি মরিতে চাস।
তুই শুধু ওরে করিস রোদন
ফেলিস দুখের শ্বাস।'

এই কবিতাটি তাঁর 'প্রভাত সঙ্গীতে' স্থান পেয়েছিল। বলা বাহুল্য তখন হতেই আপনার কল্পনায় আপনি বদ্ধ থাকার দুঃসহ জীবন হতে মুক্তিলাভের আকৃতি তখনি তাঁর মনে সংক্রান্ত হয়েছিল। তার পর এক দিব্যদৃষ্টির ফলে প্রকৃতির সহিত তাঁর পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সে কাহিনীও তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে সাবিস্তারে বর্ণিত আছে। সদর স্ট্রীটের এক বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুহেলি আচ্ছন্ন আকাশ ভেদ ক'রে প্রভাত সূর্যের উদয় দেখে তাঁর মনে যে অনুভূতি জেগেছিল তাই তাঁর কারাবদ্ধ জীবনের অবসান ঘটাল। এই অভিজ্ঞতাই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'এর প্রেরণা। এই ভাবে দেখলে সেখানে যা বর্ণিত হয়েছে তা তাঁর কাব্যচেতনারই স্বপ্নভঙ্গ। এই দিব্যদৃষ্টি তাঁর অন্তর্মুখী কাব্যচেতনাকে বহির্মুখী ক'রে দিয়েছিল। ফলে প্রকৃতির সহিত তাঁর সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং 'প্রভাত সঙ্গীতেই' তাঁর কাব্য-স্রোতস্বিনীর প্রকৃত যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই যাত্রা পথে তাঁর প্রথম পরিচয় প্রকৃতির সঙ্গে। তার কত রূপ, কত বৈচিত্র্য, কত রঙের বাহার। তার সংস্পর্শে কবির লেখনীতে, ছন্দে, ভাষায় মনোহর কত কবিতা আত্মপ্রকাশ করেছে।

প্রকৃতি বিষয়ক এই কবিতাগুলির মধ্যে একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করতে পারি। কবিতাগুলি শুধু প্রকৃতির বিভিন্ন ভঙ্গির মনোরম বর্ণনায় সীমাবদ্ধ নয়; তার অতিরিক্ত জিনিস তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। কবি প্রকৃতির শোভা দেখেই মুগ্ধ হন না, তার পশ্চাতে

একটি প্রচ্ছন্ন শক্তির অব্যক্ত উপস্থিতিও উপলব্ধি করেন। ফলে তাঁর মনে এক অবস্থায় সেই প্রচ্ছন্ন সত্তাকে দেখবার এবং তাঁর সহিত পরিচিত হবার জন্য একটি তীব্র আকুতি জাগে। এ বিষয় তিনি নিজেই এক অবস্থায় অবহিত হয়েছিলেন। তাঁর নীচে উদ্ধৃত মন্তব্যে আমরা তার সমর্থন পাই। মন্তব্যটি ইংরাজিতে রচিত। তাই তার অনুবাদ নীচে উদ্ধৃত করা হল:

"ন।-ঝরা বৃষ্টির ভারে অবনমিত মেঘের পুঞ্জের বিস্ময়, হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটায় নারিকেল গাছের সারির দেহে প্রবল আন্দোলন, প্রখর বৈশাখের মধ্যাহ্নের নিদারুণ নিঃসঙ্গতা, শরতের প্রাতে কুয়াশার পর্দার আড়ালে নীরব সূর্যোদয়—এরা আমার মনকে একটি সর্বব্যাপী সত্তার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করেছে।"[২২]

কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা তাঁর মনে একদিন গড়ে ওঠে নি ; তা ধীরে ধীরে তাঁর মনে বিভিন্ন অনুভূতির মধ্য দিয়ে পরিণত রূপটি লাভ করেছিল। তাঁর মনের মধ্যে এই উপলব্ধির যে ধীরে ধীরে বিকাশ ঘটে।হল সে বিষয়ও তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি এমনি আত্মসচেতন কবি। তাই দেখি তিনি এ বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাটির সঙ্গে বৈদিক যুগের ঋষিদের মধ্যে যে ভাবে এক ব্যাপক সত্তার ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তার সহিত তুলনা করেছেন। তাঁর একটি মন্তব্য হতে এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। সেটিও ইংরাজিতে রচিত হওয়ায় তার বাংলা অনুবাদ নীচে উদ্ধৃত হল। মোটামুটি তিনি বলতে চেয়েছেন তাঁর সাধনজীবনের প্রথম অধ্যায়ে নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি তাঁর বৈদিক পূর্বপুরুষের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছিলেন:

"অতীতের সেই দিনগুলির দিকে ফিরে চাইলে আমার মনে হয় যে না জেনে আমি আমার বৈদিক পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করেছিলাম

২২ Religion of Man, The Vision

এবং আমার দেশের আকাশের মধ্যে নিহিত একটি সুদূর সত্তার অস্তিত্বের ইঙ্গিতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।'[২৩]

বৈদিক পূর্বপুরুষের উপলব্ধির সঙ্গে তাঁর নিজস্ব সাধনজীবনের এই উপলব্ধির তুলনা সত্যই করা যায়। ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন সূক্তের মধ্যে বৈদিক ঋষির সাধনজীবনের উপলব্ধির ইতিহাসের প্রমাণ আছে। সেখানেও দেখি তাঁদের ধর্ম তথা দর্শন সম্পর্কিত উপলব্ধি তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে। প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির বক্ষে যেখানেই শক্তির উপস্থিতি লক্ষিত হয়েছে বা সৌন্দর্যের বিশেষ প্রকাশ দেখা গেছে সেখানেই এদের ওপর দেবত্ব আরোপ ক'রে স্তুতি বচন রচিত হয়েছে। এই ভাবেই বিভিন্ন বৈদিক দেবতার আবিষ্কার ঘটেছে। সূর্য দেবতার আসন পেয়েছে বিভিন্ন নামে, বায়ু পেয়েছে, সমুদ্র বরুণ দেবতা বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। অগ্নিও দেবত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে একটি বিশেষ অধিকার পেয়েছে। তা হল যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য। আকাশও দেবতা হয়েছে। ভোর আকাশের রাঙিমা উষা নাম পেয়ে দেবত্বে ভূষিত হয়েছে। এই ভাবে বহু দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে।

এর পর দেখি বৈদিক ঋষির মনে একটি আকূতি জেগেছে এক অতিদেবতা আবিষ্কার করবার জন্য। তার একটা কারণ ছিল। তিনি গভীরতর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, যে সব শক্তিগুলির উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছে তারা বিশিষ্টভাবে কাজ করে না, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, তারা যেন পরস্পরের সহযোগিতা ক'রে এক যোগে কাজ করে। সূর্য তাপ দেয়, আকাশের মেঘ জল দেয়, নদী তা নিজের বক্ষে বহন ক'রে এনে ধরণীকে শস্যমণ্ডিত ক'রে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত করে। তিনি অনুমান করেছিলেন এই বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য নিশ্চয় এক নিয়ামক শক্তি আছেন এবং তিনিই এই অতিদেবতা। নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি

২৩ Religion of Man, The Vision

শেষে বরুণকেই সেই অতিদেবতার পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন ; কারণ তাঁর ধারণায় বরুণই সেই নিয়ামক শক্তি। তাঁর ভূমিকা হল বিভিন্ন দৈবশক্তির মধ্য দিয়ে নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করা। তাই তাঁর নাম দেওয়া হল 'ধৃতব্রত' এবং 'ধর্মস্য গোপ্তা'।

এই ভাবে বৈদিক ঋষির মন বহু দেবতা হতে একটি দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই ভাবে তৃতীয় অবস্থাটির সূত্রপাত হল। তখন তিনি বললেন বিশ্বে বহু দেবতা নেই এবং অতিরিক্ত নিয়ামক শক্তি হিসাবে এক অতিদেবতাও নেই। আছেন একটি মাত্র দেবতা, ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁর প্রকাশ। মানুষ একই দেবতাকে তাই ভুল ক'রে বহু নামে ভূষিত করে। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। পরিণত অবস্থায় এই উপলব্ধি আর একটু রূপ পরিবর্তন করল। বিশ্বকে যে মহাশক্তি ধারণ করেন তিনি এক সর্বব্যাপী সত্তারূপে কল্পিত হলেন। বেদের বহু দেবতা তাঁদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে এক সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন নৈর্ব্যক্তিক সত্তায় পরিণত হলেন। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন আমরা পাই পুরুষ সূক্তের মধ্যে।[২৪] বিশ্বসত্তার সর্বব্যাপিত্ব পরিস্ফূট করবার জন্য সমগ্র বিশ্বকে একটি অতিকায় সর্বব্যাপী পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। পরবর্তী কালে উপনিষদে তিনিই ব্রহ্ম বা ভূমা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। এইভাবে বৈদিক ঋষির সাধনজীবনের উপলব্ধির পরিণত-রূপটি আত্মপ্রকাশ করেছে সর্বেশ্বরবাদে।

রবীন্দ্রনাথের সাধনজীবনের প্রথম অধ্যায়ের ইতিহাসের সঙ্গে বৈদিক ঋষির উপলব্ধির সহিত আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কবি-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ যে ঘটে প্রকৃতির সঙ্গে পুনর্মিলনের পর সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সময় প্রকৃতির বক্ষে নানা সৌন্দর্য ও শক্তির সমাবেশ তাঁর কবিমনকে আকৃষ্ট করত। নারিকেল বৃক্ষ শ্রেণীর উপর বাতাসের খেলা, সজল কালো মেঘের সুদূর বিলম্বিত দেহ, উদয়

২৪ ঋগ্‌বেদ ।।২০।।৯

আকাশের ভালে রাঙা টিপটির মত অরুণোদয়—এরাই ছিল তাঁর কবিতার প্রেরণা। কিন্তু কেবল তাদের বাহিরের সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে নি, অতিরিক্ত ভাবে তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত এক নিগূঢ় সত্তার অস্তিত্বের ইঙ্গিতও তিনি তাদের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির সহিত পরিচিত হবার জন্য তিনি আকুল হয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উপরের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা হতে দু-একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। তা হতে তাঁর উপলব্ধি কি ভাবে বিকাশের পথে এগিয়ে গিয়েছিল তা বেশ সহজে বোঝা যাবে। শরতের আকাশে ইতস্তত সঞ্চরমান মেঘগুলি শুধু তাঁর নয়ন-রঞ্জন করে নি, যিনি তাদের ভাসিয়েছেন তাঁর কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে:

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।[২৫]

প্রথম বর্ষার আগমনে যখন নীল নবঘন সমগ্র গগনে বিস্তার লাভ ক'রে তিল ঠাঁই আর রাখে না তখন সে ভীষণ-মধুর পরিবেশ তাঁর হৃদয়কে নাচিয়ে তোলে। এখানেও তিনি তার পেছনে এক প্রচ্ছন্ন শক্তির উপস্থিতি অনুভব করেন। শুধু অনুভব করেই ক্ষান্ত হন না, তাঁকে পাবার জন্য উল্লাসে আকুল হয়ে ওঠেন:

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে
হৃদয় নাচেরে।
শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ

২৫ গীতাঞ্জলি

আকুল হইয়া আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।[২৬]

অবশেষে নানা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনিও একদিন এই প্রচ্ছন্ন শক্তির প্রকৃতির পরিচয় লাভ করলেন। বৈদিক যুগের ঋষির মতই তিনি একদিন আবিষ্কার করলেন যে প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁর আভাসে ইঙ্গিতে প্রচ্ছন্ন-প্রকাশ তিনি উপলব্ধি ক'রে আসছেন, তিনিও এক সর্বব্যাপী মহাসত্তা। তিনি সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত ক'রে আছেন। প্রকৃতির মধ্যে বৃক্ষে, লতায়, পত্রে, পুষ্পে যে প্রাণস্পন্দন আমাদের নয়নরঞ্জন করে, তারা সেই প্রচ্ছন্নসত্তার আলোয় চরা ধেনু। আর গগনে যে অগণিত নক্ষত্ররাজি নিশার আকাশ উদ্ভাসিত করে তারা সব তাঁর আলোক ধেনু। তারা প্রকট, কিন্তু যিনি তাদের চরিয়ে বেড়ান, সেই রাখালটিকে কোথাও দেখা যায় না, কেবল তাঁর বেণু শোনা যায়ঃ

এই যে তোমার আলোক ধেনু
সূর্য তারা দলে দলে
কোথায় বসে বাজাও বেণু,
চরাও মহাগগন তলে।[২৭]

৫

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সর্বব্যাপী সত্তার আবিষ্কার করলেন। এখানেই তাঁর সাধনজীবনের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। তাঁর মতিগতি, তাঁর মনের আকৃতির সঙ্গে এই উপলব্ধি সামঞ্জস্য রক্ষা করে না। তিনি স্বভাবত কবি, তাঁর হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। তিনি বিশ্বসত্তাকে শুধু জেনে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, তিনি তাঁকে অতিরিক্ত-

২৬ ক্ষণিকা
২৭ গীতিমাল্য

ভাবে পেতে চাইলেন। কিন্তু যে সত্তাকে তিনি আবিষ্কার করলেন তিনি শুধু প্রচ্ছন্ন সত্তা নন, এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। তাঁকে পেতে হলে তাঁর সহিত প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন; কিন্তু যিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা তাঁর সহিত এই প্রকৃতির ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়।

এই ভাবে তিনি এক দোটানার মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁর হৃদয় চায় বিশ্বসত্তার প্রকৃতি এমন হক যাতে তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব হয়; কিন্তু উপলব্ধি তাঁর যে পরিচয় এনে দিল তা বলে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। এর সমাধান কি? উপলব্ধিকে অস্বীকার ক'রে নিয়ে কি তিনি বিশ্বসত্তার উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করবেন? তাঁর মন তাও করতে চায় না। এই সমস্যার সমাধান তিনি এক অভিনব পথে করলেন। এ বিষয়ে মনে হয় তিনি প্রকৃতির কাছ হতে সমাধানের সূত্র পেয়েছিলেন; কারণ একটি সহজলভ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য হতেই তার উৎপত্তি। সমাধানের এই সূত্রটি তাঁর একটি কবিতার মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

সেই কবিতার বিষয়টি হল এই। আকাশের সূর্য এত বিরাট যে তা কল্পনা করা যায় না। তা এমন প্রচণ্ড শক্তির আধার যে আকাশের মতই অন্তহীন পরিবেশ চাই তাকে ধারণ করবার জন্য। যা এত বিরাট, যার জ্যোতি কোটি কোটি মাইল অতিক্রম ক'রে মহাকাশের এক বিশাল অংশ উদ্ভাসিত করে, তার কাছে পৃথিবীর বক্ষে অবস্থিত ক্ষুদ্র বস্তুগুলি একান্তই উপেক্ষণীয়। প্রভাতকালে তৃণ খণ্ডের আগায় যে শিশিরবিন্দুকে লম্বমান দেখা যায় তা এমনি একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু। কাজেই তার সূর্যের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছা হলে তা পূরণ করা সম্ভব নয়, কারণ সূর্য এত বিরাট যে তার ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা উচিত নয়। কিন্তু কবি এখানেও প্রীতির সম্বন্ধ ঘটেছে দেখতে পান। তিনি বলেন তা না হলে শিশিরকণা সূর্যের কিরণকে প্রতিফলিত করতে পারে কি ক'রে?

তিনি তাই বলেছেন, তা এত ক্ষুদ্র আর তপন এত বিরাট যে

তার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করবার কথা শিশিরবিন্দু ভাবতেই পারে না। তাই সে সূর্যের স্বপ্ন দেখেই তৃপ্তি খোঁজে। সে দুঃখ ক'রে বলে ঃ

হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা।
ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে, করিতে পারি নে সেবা।[২৮]

সূর্য তখন তাকে প্রত্যুত্তরে বলে যে সে বিরাট হলেও সে ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করবার ক্ষমতা রাখে। শুধু ক্ষমতা রাখে না, তার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে উৎসুক; তা না হলে শিশিরবিন্দুর বক্ষে প্রতিফলিত হয়ে এমন ঝলমল করবে কেন? তাই সে উত্তর দেয় ঃ

'আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি বাসিতে পারি যে ভালো।'

এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেই যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্যার সমাধান সূত্র পেয়েছিলেন। এটা মনে করার সপক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। আমরা দেখব তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যার যে সমাধান করেছেন তাও এই পথেই। সূর্যের এখানে দুটি ভূমিকা কল্পিত হয়েছে। একটি নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা। সেখানে তার কাজ বিশ্বে কিরণ ছড়ানো। অন্যটি ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তার ভূমিকা। সেখানে তা শিশিরবিন্দুর মত ক্ষুদ্র জিনিসের সহিতও মিতালি করবার ক্ষমতা রাখে এবং করতে উৎসুক। আমরা দেখব তিনি যে দোটানার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার সমাধানও করেছিলেন অনুরূপ পথে। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে বিশ্বসত্তার যুগপৎ দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ ঘটে। একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ; সেখানে তিনি এক বিরাট নৈর্ব্যক্তিক মহাশক্তি হিসাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করেন। অপরটি ব্যক্তিরূপে প্রকাশ; সেখানে তিনি ভক্ত বিশেষের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে

২৮ উৎসর্গ। ১২

উৎসুক। এ বিষয় সবিস্তারে আলোচনা পরে যথাস্থানে হবে। তার আগে তিনি বিশ্বসত্তার ব্যক্তিরূপে প্রকাশ কি ভাবে উপলব্ধি করলেন তার আলোচনা ক'রে নেওয়া প্রয়োজন।

ভক্ত বিশেষের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে উৎসুক পরম সত্তার ব্যক্তিরূপে যে প্রকাশ, তাকে ঘিরেই রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্ব। ঠিক বলতে কি তিনি তাঁকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। তিনি কবির সমগ্র জীবনের কর্ণধার। তিনি নির্লিপ্ত অথচ কবির জীবনতরীর অলক্ষ্যে হাল ধরে তাঁর জীবনকে নিত্য গড়ে তুলতে আনন্দ পান। কাজেই তিনি জীবনশিল্পীও বটেন। তাই তিনি বলেছেন: "এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।"[২৯]

ভক্তের সঙ্গে এই জীবনদেবতার সম্বন্ধটি অনেকটা নাট্যপরিচালকের সঙ্গে মঞ্চশিল্পীর সম্বন্ধের সহিত তুলনীয়। উভয়েই ব্যক্তিরূপী সত্তা, উভয়ের মধ্যেই একটি প্রীতির সম্বন্ধ বর্তমান। পরিচালক নিজে অভিনয় করেন না, শিল্পী করেন। শিল্পী ভালো অভিনয় করলে তিনি তৃপ্তি পান, আনন্দ পান। শিল্পীর ভিতর দিয়ে পরিচালক নিজের তৃপ্তি খোঁজেন। সেইরূপ জীবনদেবতা কবির জীবনশিল্পীরূপে তাঁর জীবনকে মনের মত ক'রে গড়ে তুলতে আনন্দ পান। এই জন্যই বিশ্বসত্তার এই প্রকাশকে তিনি আনন্দের প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন।

এই জীবনদেবতা-তত্ত্বটি যুক্তি দিয়ে গড়ে তোলা একটি দার্শনিক তত্ত্ব নয়। প্রথমে ধীরে ধীরে তাঁর মতিগতির পথে মনে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে পরে হঠাৎ একদিন একটি দিব্য অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি এ বিষয় তাঁর অক্সফোর্ড

২৯ আত্মপরিচয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালায় সবিস্তার উল্লেখ করেছেন।[৩০] এখানে সংক্ষেপে তার একটি বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

ঘটনাটি যখন ঘটে তখন তিনি পৈত্রিক জমিদারীর তত্ত্বাবধানের কাজে উত্তর বঙ্গে ঘুরতেন। ঘটনাটি ঘটে তাঁদের সাজাদপুরের কাছারি বাড়ীতে অবস্থান কালে। সেদিন সকালে প্রাতঃকালীন কাজকর্ম শেষ ক'রে এসে তিনি কুঠিবাড়ীতে ফিরে এসেছেন। স্নানের পূর্বে তিনি দোতলায় এক জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কাছেই বাজার। তার পাশে একটি মরা খালে প্রথম বর্ষণের জল জোয়ার এনেছে। হঠাৎ তাঁর অন্তর উদ্ভাসিত ক'রে একটি অনুভূতি জাগল। তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর সমগ্র জীবনের খণ্ড অভিজ্ঞতাকে ব্যাপ্ত ক'রে একটি যোগসূত্র যেন রয়েছে। তাঁর মনে হল তাঁরই অন্তরে একটি ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট সত্তা রয়েছেন এবং তিনি কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা করছেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর মনে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মাল যে একটি বিশেষ সত্তা তাঁকে এবং তাঁর বিশ্বকে ব্যাপ্ত ক'রে আছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁর পূর্ণতম প্রকাশের সন্ধান করছেন।[৩১]

এঁরই তিনি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়েছেন। মনে হয় 'চিত্রা'য় 'জীবনদেবতা' শীর্ষক কবিতাটি এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা। এই সত্তা তাঁর জীবনের কর্ণধার, তিনি কবির জীবনকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। ইনি ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর হয়ে তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠান নিয়েছেন যেন নিজেরই গরজে। ইনি ত্রিভুবনেশ্বর হয়েও ভক্তের সহিত প্রেমের বন্ধনে মিলিত হতে চান,

৩০ Religion of Man, The Vision ; মানুষের ধর্ম-সংযোজন, ৩

৩১ I felt sure that some Being who comprehended me and my world, was seeking his best expression in all my experiences, uniting them into an ever widening individuality which is a spiritual work of art. —*Religion of Man, The Vision.*

কারণ ভক্তের জীবনকে সার্থকতা মণ্ডিত ক'রে তাঁর নিজেরই তৃপ্তি। তাই কবি বলেছেন, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই উপলব্ধির সমর্থন অন্যত্রও কিছু পেয়েছিলেন। সে কথাও তিনি হিবার্ট বক্তৃতামালায় উল্লেখ করেছেন। দুজায়গা হতে এই সমর্থনের উল্লেখ আছে। একটি হল উপনিষদের এক তাৎপর্যপূর্ণ বাণী এবং অপরটি হল বাংলার বাউলের সাধনতত্ত্ব। উপনিষদের সমর্থনের কথাটাই প্রথম উল্লেখ করা যেতে পারে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে একটি শ্লোক আছে। তার বাংলা অনুবাদ দাঁড়ায় এই: দুটি পাখী আছে; তারা পরস্পরের সখা এবং এক সঙ্গে একই বৃক্ষে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের একটি সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করছে, অপরটি ভক্ষণ না ক'রে বসে আছে।[৩২] এই শ্লোকের মনে হয় একটি রূপক অর্থ আছে। মানুষের মধ্যে যেন দুটি সত্তা ক্রিয়া করে। একটি ভোগ করে এবং অপরটি বিকারহীন চিত্তে তার সাক্ষ্য হয়ে বসে থাকে। একটি জীবাত্মা এবং অন্যটি অন্তর্যামী আত্মা। শ্লোকে বর্ণিত বৃক্ষ যেন মানুষের দেহ, আর যে পাখী ফল আস্বাদ করছে সে যেন ব্যক্তি মানুষ এবং যেটি উদাসীন বসে রয়েছে তা যেন পরমাত্মার সমস্থানীয়।

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনদেবতা-তত্ত্বের সমর্থন পেয়েছিলেন। যিনি ব্রহ্মরূপে অসীম এবং নৈর্ব্যক্তিক সত্তা তিনি ব্যক্তির হৃদয়ে সীমায় আবদ্ধ হয়ে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর হিসাবে ধরা দেন। এটি সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশের স্বীকৃতি বলেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, অসীমের সঙ্গে সীমাবদ্ধ ব্যক্তি মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের এটি একটি চিত্র। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে এই দুটি পাখীই আছে; একটি হল বাস্তব যা সংসার করে এবং অপরটি হল মানসিক এবং অরূপ যা আনন্দ অনুভব করে।

৩২ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৪ ॥ ৬

রবীন্দ্রনাথ বাউল সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বের. কথাও তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায় সবিস্তার উল্লেখ করেছেন। এই সম্প্রদায় পরমসত্তাকে ব্যক্তিত্বে ভূষিত ক'রে মানুষরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ক'রে তাঁর পূজা করে। তাঁকে তারা নরনারায়ণ বলে, কারণ তিনি দেবতা হয়েও মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য মানুষের মনে ধরা দেন। তাঁকে তারা তাই 'মনের মানুষ' বলে ; কারণ তাদের বিশ্বাস অরূপ আকারে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে তিনি অবস্থান করেন। এই প্রসঙ্গে এক বাউল কবির একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায় তার অনুবাদ দিয়েছেন :

তুমি হলে নরনারায়ণ।
এটা ভ্রান্তি নয় এ কথা সত্য।
তোমার মধ্যে অসীম সীমাকে খোঁজে,
পরিপূর্ণ জ্ঞান খোঁজে প্রেমকে।
আর যখন রূপের সঙ্গে অরূপ
প্রেমের বন্ধনে সংযুক্ত হয়
তখন প্রেম ভক্তি রূপে সার্থক হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্বের সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বের আশ্চর্য রকম মিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বিশ্বসত্তারই এক ব্যক্তিরূপী প্রকাশ। তিনি অরূপ। তাই তাঁকে কোথাও 'অন্ধকার ঘরের রাজা' বলে কল্পনা করেছেন, কোথাও 'অরূপরতন' বলেছেন। হৃদয়ের নিভৃতে তাঁকে একাকী পাওয়া যায় ; কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। বিষয়টি তাঁর একাধিক প্রতীকধর্মী নাটকে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার এখানে সবিস্তার উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তিনি তাঁর প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন এই বলে যে ইনি সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত থাকলেও অন্তরের মধ্যে তাঁর আনন্দরূপকে উপলব্ধি করা যায়। এঁকেই তিনি 'গীতাঞ্জলি'র

একটি কবিতায় সীমার মাঝে অসীম বলে বর্ণনা করেছেন। যেখানে তিনি অসীম সেখানে তিনি বিশ্বকে ব্যাপ্ত ক'রে নৈর্ব্যক্তিক শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করছেন; আর যেখানে তিনি ভক্তের মনের মধ্যে ধরা দিয়েছেন সেখানে নিজেকে সীমার মধ্যে বেঁধে ব্যক্তিরূপী সত্তায় পরিণত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রতীকধর্মী নাটক 'অরূপরতন'এর ভূমিকা হতে তাঁর এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে—আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে তুমুল মতবিরোধ আছে। বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করবার এখানে প্রয়োজন নেই। তবে উপরের ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য কিনা, তার সমর্থনে কিছু বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সমর্থন রবীন্দ্রনাথের নিজের বচন হতে উদ্ধৃত করাই যুক্তিযুক্ত। সূত্রকার যখন নিজেই ভাষ্য রেখে গেছেন তখন তাকেই সব থেকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমাদের প্রতিপাদ্য হল বিশ্বসত্তা ও জীবনদেবতা একই সত্তার দুই পর্যায়ে ভিন্ন প্রকাশ। একটি সর্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিক সত্তারূপে, অপরটি ব্যক্তিরূপী ভক্তের সঙ্গে প্রীতির বিনিময়ে উৎসুক সত্তারূপে। মনে হয় তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে উল্লিখিত একটি মন্তব্য হতে এমন ধারণা হতে পারে যে বিশ্বদেবতা এবং জীবনবেবতা পৃথক সত্তা। মন্তব্যটি হল এই: "বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে গ্রহ চন্দ্র তারায়। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি, সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাঁকেই বলে মনের মানুষ।"

মনে হয় একই বিশ্বসত্তার দুই ভিন্নরূপে যে প্রকাশ এখানে তাদের পার্থক্য সূচিত করবার জন্যই এই মন্তব্য করা হয়েছে। তাঁরা যে

একেবারে দুটি ভিন্ন সত্তা, তা এখানে স্পষ্টরূপে বলা হয় নি। অপরপক্ষে দেখা যায় তাঁর বিভিন্ন উক্তিতে তাঁদের একত্বই সূচিত হয়েছে। তার কিছু প্রমাণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায় তা একরকম স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, যে শক্তি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করছেন হতে পারে তা জীবনদেবতা হতে অভিন্ন, কিন্তু ব্যক্তিরূপে তিনি আমার মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কেন্দ্রবিন্দু।[৩৩]

তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'সৌন্দর্য'শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে বিশ্বদেবতা ও জীবনদেবতা একই সত্তা, তবে তাঁদের ভিন্ন পর্যায়ে ভিন্নরূপে প্রকাশ ঘটে থাকে। তিনি সেখানে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের একটি নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন প্রকৃতির বক্ষে যে এত সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি তার একটা তাৎপর্য আছে। তা হল তাঁর ধারণায় ভক্তের নিকট পাঠানো প্রীতির নিদর্শন। তাঁর ধারণায় পরমসত্তার দুই বিভিন্ন স্তরে প্রকাশ ঘটে। একটি প্রকাশ আছে বিশ্বের নিয়ামক শক্তিরূপে। তাকে তিনি সত্যরূপে প্রকাশ বলেছেন। এখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তার মত কাজ করেন। এখানে বিশ্ব নিয়ম দ্বারা শৃঙ্খলিত। এখানে মানুষ সে নিয়মে চলতে বাধ্য। তার ব্যতিক্রম নেই। আর একটি প্রকাশ আছে যাকে তিনি আনন্দরূপে প্রকাশ বলেছেন। এখানে বিশ্বসত্তা জগৎ জুড়ে নানা সৌন্দর্যের নিদর্শন স্থাপন ক'রে যেন ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলেন, আমার প্রেম তোমায় দিচ্ছি, তোমার প্রেম আমাকে দাও। এখানে তিনি ব্যক্তিরূপী মানুষের প্রেম ভিক্ষা করেন, কিন্তু ভক্ত এখানে ইচ্ছা করলে সাড়া দিতে পারে, নাও পারে। কারণ জোর ক'রে তো

৩৩ It may be that it was the same creative thing that is shaping the universe to its eternal idea , but in me as a person, it has one of its special centres of personal relationship.

—*Religion of Man, The Vision*

প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় না। তবে সাড়া না দিলে সে পরম সত্তার আনন্দরূপের পরিচয় পায় না। তিনি এখানে বন্ধুর বেশে আসেন, শাসন দণ্ড নিয়ে আসেন না। "এই প্রসঙ্গে তাঁর নীচের মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ: "এই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে এবং আনন্দের মূর্তি দেখতে পাই সৌন্দর্যে। এইজন্য সত্যরূপের পরিচয় আমাদের অত্যাবশ্যক, আনন্দরূপের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে।"[৩৪]

এর পরেও যদি কেউ মনে করেন আমাদের প্রতিপাদ্যে ভ্রান্তির অবকাশ আছে, তা হলে জীবনদেবতা-তত্ত্বের সহিত বিশ্বসত্তার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ক'রে তাঁর নিজের যে একটি মন্তব্য আছে তা উল্লেখ করা যেতে পারে। মন্তব্যটি পাই একটি চিঠির মধ্যে। তাঁর সমালোচক টমসন তাঁকে সোজাসুজি চিঠি লিখেছিলেন জীবনদেবতা-তত্ত্বের ব্যাখ্যা চেয়ে। উত্তরে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাতেই এই ব্যাখ্যাটি পাওয়া যায়। তিনি সেখানে স্পষ্টতই বলেছেন যে এই তত্ত্ব উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাঁর মতে এই তত্ত্বের দুটি অঙ্গ আছে। একটি বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদের মত ঈশ্বর ও ভক্তের ব্যক্তিরূপে পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করে। অপরটি উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের মত একটি সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে গ্রহণ করে। ঈশ্বর একাধারে দুই। একরূপে তিনি ব্যক্তিবিশেষের প্রেমের ভিখারী এবং অপর রূপে বেদান্তের কল্পিত সকল বস্তুর ধারক সত্তাও বটে।[৩৫]

জীবনদেবতা-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মধ্য জীবনে . তাঁর সাহিত্যকে চূড়ান্তরূপে প্রভাবান্বিত করেছিল। ঠিক বলতে কি দীর্ঘ কয়েক বৎসর

৩৪ শান্তিনিকেতন। সৌন্দর্য

৩৫ The idea has a double strand. There is the Vaisnava dualism always keeping the separateness of the self and there is the Upanishadic monism. God is wooing each individual and is also the ground reality of all as in the Vedantic unification.

ধরে তাই তাঁর রচিত কবিতার প্রেরণারূপে ক্রিয়াশীল ছিল। ফলে সাহিত্যিক ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল। একই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বিরামহীন ধারায় কবিতার পর কবিতা লিখিত হয়েছিল। সেই কবিতাগুলি সংখ্যায় এত বেশি যে তাদের নিয়ে তিনটি কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তারা হল 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'। তিনটি গ্রন্থের প্রায় সকল কবিতা জীবনদেবতাকে উদ্দেশ্য ক'রে লিখিত বললে ভুল হবে না। গ্রন্থ তিনটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। প্রথম প্রকাশিত হয় 'গীতাঞ্জলি'। তাতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত কবিতাও কিছু আছে। কাজেই এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জীবনদেবতা-তত্ত্ব তাঁর জীবনে পাঁচ বছরের অধিককাল মূল প্রেরণার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল।

এই তিনখানি গ্রন্থে, বিশেষ করে 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথের সাধনজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ইতিহাসটি যেন কবিতায় রচিত হয়ে গেছে। যেমনি তাঁর ধারণা হল ঈশ্বর ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট হয়ে তাঁর সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন, অমনি তাঁর সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে ফুটে উঠল। তিনি মিলনের জন্য ব্যাকুল হলেন, কিন্তু প্রেমাস্পদ এলেন না। তখন বিরহবোধ ঘনীভূত হল। তার পর তাঁর উপলব্ধ হল তিনি ত একটি বিশেষ রূপে আসেন না, তিনি প্রকৃতির মধ্যে নানা সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটিয়ে তাঁর প্রীতির পরিচয় দেন। তাঁকে পেতে হলে বাহিরে খুঁজলে চলবে না, হৃদয়ে তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে। এই উপলব্ধির পরেই মিলন ঘটল। সেই মিলনের যে আনন্দ তার উচ্ছ্বাস অনেক কবিতায় প্রতিফলিত। মিলন হলেও জীবনদেবতার সঙ্গে সম্বন্ধটি কি রূপ তাই নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেল। কবি তাঁকে চান বন্ধুরূপে, কিন্তু বাধা আসে পিতা বলে প্রণাম করে বসেন। এই বাধা কাটিয়ে যখন সাম্যের ভিত্তিতে প্রেম উদ্বেলিত হল তিনি তখন এই বুঝে তৃপ্তি পেলেন যে তাঁর যেমন ভুবনেশ্বরকে পাওয়া প্রয়োজন, তেমন তাঁকে না হলেও ভুবনেশ্বরের প্রেম সার্থকতা মণ্ডিত হয় না।

এই ভাবে এই বিচিত্র ইতিহাসে কতকগুলি দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা পাওয়া যায়। তারা হল—(১) জীবনদেবতাকে পাবার তীব্র আকুতি (২) না পাওয়ার বেদনা বোধ (৩) নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁর প্রেমের পরিচয় লাভ (৪) তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে আবিষ্কার এবং সর্বশেষে (৫) পরস্পরের প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে প্রেমের বিকাশ তাতে উল্লাস বোধ। তাকেই তিনি সীমার মাঝে অসীমকে কেন্দ্র ক'রে মধুর রসের বিকাশ বলেছেন।

এই পাঁচটি অবস্থার ভিতর দিয়ে তিনি নিজস্ব সাধনজীবনে কেমন ভাবে জীবনদেবতার সহিত পরিপূর্ণ মিলনের পথে এগিয়ে এসেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য তাঁর নিজের বিভিন্ন অবস্থায় উপলব্ধিগুলি তাঁর এই সময় রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হতেই সংগৃহীত হবে। কারণ এই কবিতাগুলি তাঁর মনের এই অবস্থার অনুভূতি পরম্পরাকে প্রতিফলিত করে।

যখন কবির মনে এই ধারণা জাগল যে বিশ্বসত্তা জীবনদেবতা রূপে তাঁর প্রীতি পেতে উন্মুখ তখনই তাঁর হৃদয়ে তাঁকে পাবার জন্য আকুলতা উদ্বেল হয়ে উঠল। সে বিরহবোধের সহিত বোধ হয় শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহবোধের তুলনা চলে। এই অবস্থা সূচিত করতে এই কাব্যাংশটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে বাজে হে।
কত রূপ ধ'রে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে॥[৩৬]

দ্বিতীয় অবস্থায় না পাওয়ার বেদনাবোধ যখন তীব্র হয়ে উঠল তখন জীবনদেবতার সহিত বিচ্ছেদ একান্তই অসহ্য বোধ হল। তখন তিনি ধৈর্যহারা হৃদয়ের করুণ আবেদন জানালেন। তাঁর এই তীব্র বেদনার অনুভূতি এই কাব্যাংশে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে মনে হয়:

৩৬ গীতাঞ্জলি, ২৫

তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো।
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো ॥[৩৭]

পরের অবস্থায় দেখি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে কবির মন জীবনদেবতার প্রীতির স্পর্শ পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়েছে। ফলে তাঁর তীব্র বেদনাবোধের ওপর ছেদ পড়েছে এবং তার স্থান নিয়েছে উদ্বেল উল্লাস। এই অবস্থায় সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় নীচের দুটি কাব্যাংশে। কবির চেতনায় প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সৌন্দর্যের বিকাশ তা যেন জীবনদেবতার পাঠানো প্রেমের লিপি :

এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ।
এই-যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ।
এই যে মধুর আলসভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ'পরে
এই-যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ।
এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ ॥[৩৮]

তাঁর প্রীতির পরিচয়ে কবির যে উল্লাসবোধ তার সুন্দর পরিচয় পাই এই কাব্যাংশে :

আলোয় আলোকময় কর হে এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যেদিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবই ভালো।[৩৯]

৩৭ গীতাঞ্জলি, ৫৭
৩৮ গীতাঞ্জলি, ৩০
৩৯ গীতাঞ্জলি, ৪৫

'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে 'সৌন্দর্য' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের অন্তরাত্মার আমি ক্ষেত্রের একটি সৃষ্টিছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যাতায়াত আছে।' তাঁর ধারণা, তিনি অরূপ, তাঁকে বাহিরে পাওয়া যায় না, তাঁকে হৃদয়ের অন্ধকার মন্দিরে পাওয়া যায়, বাহিরে নয়। মনে হয় সেই উপলব্ধি যেন পরের অবস্থায় তাঁর মনে জেগেছিল। তার উল্লেখ নীচের কাব্যাংশে পাই :

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাই নি।
বাহিরপানে চোখ মেলেছি
হৃদয়পানে চাই নি ॥[৪০]

এর পরের অবস্থাতে পাই প্রীতির আদান-প্রদানের পরিচয়। কিন্তু এখানেও প্রথম অবস্থায় সাম্যের ভিত্তিতে সংকোচহীন মনে মিলনের উপযুক্ত মনোভাব ফুটে ওঠে নি দেখা যায়। মনের ইচ্ছা বন্ধুরূপে মিলবার, কিন্তু সংস্কার এসে বাধা দেয়; যিনি বড় তাঁকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেন কি ক'রে? তাই বন্ধু বলে হাত না ধরে পায়ে প্রণাম ক'রে বসেন। এই সংস্কার ও ইচ্ছার দ্বন্দ্বের যে দোটানা তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় নীচের কাব্যাংশে :

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে দু-হাত ধরি নে।
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধ'রে
সঙ্গী বলে তোমায় বরি নে ॥[৪১]

৪০ গীতিমাল্য, ৯২

৪১ গীতাঞ্জলি, ৯২

এই সংকোচ ভাব অতিক্রম করবার পরেই জীবনদেবতার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনের পথ প্রস্তুত হল। তখনই সীমার মধ্যে অসীমের মিলনে মধুর-রসের ধারা উৎসারিত হল। তখনই তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে এই কথা বলতে পারলেন :

তাই তোমার আনন্দ আমার' পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে ॥[৪২]

৬

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সাধনজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। জীবনদেবতার সহিত মিলনে তার হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তি হয়েছিল প্রচুর; কিন্তু তার মধ্যেই অসন্তোষের বীজ আত্মগোপন করেছিল। তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে তিনি সাধনজীবনের পরিণতির পথে তৃতীয় ও শেষ অধ্যায়ে উত্তীর্ণ হলেন। সেই পথেই তাঁর মানবিকতার জন্ম। সেটি সংঘটিত হয়েছিল এই ভাবে।

রবীন্দ্রনাথ ধর্মসাধনার যে আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন তা বলে আদর্শ ধর্ম এমন হওয়া চাই যা মানুষের তিনটি মৌলিক বৃত্তি—বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তির সমান পরিবর্দ্ধনের সুযোগ দেবে। তিনি শীঘ্রই উপলব্ধি করলেন যে জীবনদেবতা তত্ত্ব এই আদর্শের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে না। জীবনদেবতা তত্ত্ব হৃদয়বৃত্তিকে প্রচুব যে দেয় তা সন্দেহাতীত। কিন্তু তা হৃদয়কে পরিপূর্ণভাবে তৃপ্তি দিতে পারে না। যাকে ভালোবাসি, প্রীতি করি তাকে সেবা করতে ইচ্ছা করে। এই ইচ্ছা সফল হলে কর্মবৃত্তির ও প্রয়োগের ক্ষেত্র মিলে যায়। কিন্তু জীবনদেবতা এমন প্রকৃতির সত্তা যে তাঁকে সেবা করার উপায় নেই।

৪২ গীতাঞ্জলি, ১২১

কারণ, তিনি ব্যক্তিত্ববিশিষ্টরূপে কল্পিত হলেও তিনি অরূপ, বাহিরে তাঁর প্রকাশ নেই। তাঁকে ভালোবাসা যায়। কিন্তু সেবা করা সম্ভব হয় না। কাজেই একটি বিষয়ে বিশেষ অতৃপ্তি রয়ে যায়।

তিনি তখন নূতন ক'রে আবার এর সমাধানের সূত্র খুঁজতে আরম্ভ করলেন। তিনি দেখলেন বিশ্বদেবতা তত্ত্ব বা জীবনদেবতা তত্ত্ব কোনোটিই সম্পূর্ণভাবে মনের তৃপ্তি দিতে পারে না। বিশ্বদেবতাকে আমরা জ্ঞানে পাই, তিনি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা, তাঁর সহিত হৃদয়বৃত্তির সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। আমরা সর্বব্যাপী সত্তাকে সেবা করবারও সুযোগ পাই না। জল, স্থল, আকাশ—এদের ত সেবা করবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। তিনি তাই বললেন :

"আমরা বিশ্বের অন্য সর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানতে পারি। জল, স্থল, আকাশ গ্রহনক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদান-প্রদান চলে না তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গল কর্মের সম্বন্ধ নাই।"[৩৯]

অপর পক্ষে জীবনদেবতা তত্ত্বেরও একটা সার্থকতা আছে, কিন্তু তা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে মিলন হৃদয়বৃত্তির নিশ্চিত পরিপূর্ণ তৃপ্তি আনে। কিন্তু জীবনদেবতা ব্যক্তিরূপী হলেও তিনি অরূপ; কাজেই তাঁকে সেবা করবার কোনো সুযোগ পাওয়া যায় না। সেই কারণে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ঈশ্বরের সহিত সেবার সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে তাঁর কোনো মূর্ত প্রকাশকেই সেবার পাত্র রূপে গ্রহণ করতে হবে।

এখন প্রশ্ন উঠল সেই সেবার পাত্র নির্বাচিত হবে কে? তিনি এই যুক্তি প্রয়োগ করলেন যে এক্ষেত্রে যে রূপে বিশ্বসত্তা মানুষের নিকটতম সত্তারূপে প্রকট হয়েছেন, সেইরূপেই তাঁর সেবা করা উচিত। মানুষের নিকট তাঁর সব থেকে ঘনিষ্ঠ প্রকাশ মানুষরূপে।

৩৯ ধর্ম

কাজেই বিশ্বমানবকেই ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতম প্রকাশরূপে গ্রহণ ক'রে তার সেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে সেবা পৌঁছে দেওয়া যায় এই হ'ল তাঁর সিদ্ধান্ত।

তাঁর এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনের জন্য তিনি একটি সচরাচর দৃষ্ট উপমার ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন কোনো বিশেষ নারীর নানারূপে প্রকাশ থাকে। কোথাও তিনি কন্যা, কোথাও পত্নী, কোথাও সখী, কোথাও মা। কিন্তু তাঁর নিজের সন্তানের নিকট তাঁর যেটি ঘনিষ্ঠ প্রকাশ তা হ'ল মাতৃরূপে, অন্য প্রকাশ তাঁর কাছে অর্থহীন। সেই রকম বিশ্বসত্তার প্রকাশ নানাভাবে। জড়েও তাঁর প্রকাশ, ভক্তের হৃদয়ে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বররূপেও তাঁর প্রকাশ, আবার বিভিন্ন জীবরূপেও তাঁর প্রকাশ। মানুষের নিকট যে প্রকাশ তাৎপর্য-পূর্ণ তা হ'ল মানুষরূপে। মানুষকে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতম প্রকাশরূপে গ্রহণ ক'রে বিশ্বমানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করলে তবেই বিশ্বসত্তাকে সেবার মধ্য দিয়ে লাভ করতে পারি। মোটামুটি এই হ'ল তাঁর যুক্তি। তিনি তাই বলেছেন :

"মাতা যেমন একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই শিশুর সর্বাপেক্ষা নিকট, সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান —এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহাকে কর্ম করি।"[৪০]

তিনি এই প্রসঙ্গে আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের সেবা ক'রে শুধু সেবাবৃত্তির তৃপ্তি হয় না, মানুষকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের যদি ধর্ম গড়ে ওঠে তা হলে তার সঙ্গে একসঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি এবং সেবাবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ তাকে অবলম্বন করেই

আদর্শ ধর্ম গড়ে উঠতে পারে। তার সপক্ষে তিনি দু'একটি যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। যেমন, মানুষের কাছে ব্রহ্মের যে মানুষের নিকট ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ, এই উপলব্ধি বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগেই সম্ভব। সুতরাং এখানে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ ক্ষেত্র আছে। দ্বিতীয়ত, মানুষ আকাশ, বাতাস, নদীর মত জড় বস্তু নয়; সে হৃদয়বৃত্তিবিশিষ্ট জীব। কাজেই সে প্রীতির আদান প্রদান করবার ক্ষমতা রাখে। এই ভাবে হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তিরও সুযোগও ঘটে। সর্বশেষে সেবা করবার সুযোগ ত থাকেই। অতিরিক্তভাবে মানুষের সেবা কাজে লাগে, সর্বজনীন কল্যাণসাধন ক'রে তা সার্থক হয়ে ওঠে। এই জন্যই তিনি বলেছেন, ঈশ্বরকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় মানুষের মধ্য দিয়েই। আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তাঁর প্রথম দিকে উদ্ধৃত মন্তব্যটি এখানে আবার উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, কর্মবৃত্তি, আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রকাশ করিলে, তবে আমাদের পক্ষে আমাদের অধিকার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এই জন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্মদ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই।"[৪১]

এইভাবে বিশ্বমানবের মধ্যে পরমসত্তার যে অভিব্যক্তি তার সেবাই তাঁর মতে আমাদের পক্ষে আদর্শ ধর্মের স্থান গ্রহণ করবার উপযুক্ত। কারণ এখানে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তি সমানভাবে নিয়োগ করবার ক্ষেত্র পাওয়া যায়। অন্য পথে পরমসত্তার সহিত একটি বিশেষ বৃত্তির সাহায্যে মাত্র আংশিক সংযোগ ঘটে; কিন্তু এখানে তিনটি বৃত্তির সাহায্যেই পরিপূর্ণ সংযোগ ঘটে। তাই তিনি বলেছেন:

"এই জন্য মানব সংসারের মধ্যেই প্রতিদিনের ছোট বড় সমস্ত

৪১ ধর্ম

কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক, কেবল জ্ঞানের উপাসনা, সেই উপাসনা দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি; কিন্তু প্রত্যক্ষ লাভ করিতে পারি না।"[৪২]

এই উপলব্ধির ফলে যেন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং তার স্থান নিয়েছিল বিশ্ব-মানব। যেমন একাকী বনে বা বিজনে বসে ঈশ্বরের ধ্যানধারণার প্রতি তাঁর আকর্ষণ কমে গেল, তেমন নিজের মনের মন্দিরে জীবন-দেবতার সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষাও শিথিল হয়ে গেল। পরিবর্তে তিনি চাইলেন বিশ্বমানবের মধ্যে তাঁর যে প্রকাশ সেই প্রকাশের সহিতই তিনি যোগ স্থাপন করবেন। এই মনোভাবই হ'ল নীচে উদ্ধৃত কাব্যাংশের প্রেরণা:

বিশ্ব সাথে যোগে যেথা বিহার'
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।[৪৩]

এই ভাবে সাধনজীবনের শেষ অবস্থায় তাঁর নিজস্ব মানবিকতার জন্ম হ'ল। তিনি বললেন, ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে হবে বিশ্বমানবের মাঝে, তাঁকে প্রীতি করতে হবে মানুষকে প্রীতি ক'রে এবং তাঁর কাছে সেবা পৌঁছে দিতে হবে মানুষের সেবা ক'রে। বিশ্বমানবের সেবা, বিশ্বমানবের কল্যাণসাধন, এই ত হ'ল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এইরূপে পরিপূর্ণ-ভাবে ঈশ্বরের সহিত সংযোগলাভের চেষ্টার ফলে রবীন্দ্রনাথের নয়নে

৪২ ধর্ম

৪৩ গীতাঞ্জলি, ৯৮

ঈশ্বর মানবিক ধর্মে ভূষিত হলেন। বিশ্বমানবের সেবা কিভাবে করতে হবে, এ বিষয়ও তিনি চিন্তা করেছেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বরের উপাসনাকে সার্থকভাবে গড়ে তুলতে হলে মানুষের 'বিশ্বকর্মা' হতে হবে। এই শব্দটি তিনি একটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, যে কাজ কেবল ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণসাধন না ক'রে সাধারণভাবে মানুষের কল্যাণসাধন করবে তাই করতে হবে। অর্থাৎ যা বিশ্বজনীন কল্যাণ আনে, তাই করাই হ'ল বিশ্বকর্মা হওয়া। সে কাজ ক্ষুদ্র হলেও ক্ষতি নেই, তার ফলে সাধারণ মানুষের উপকার সংঘটিত হলেই তা বিশ্বজনীন কাজ, এবং যে মানুষ এইভাবে সাধারণের কল্যাণসাধন করে সেই বিশ্বকর্মা। এই সম্পর্কে তাঁর একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন ঈশ্বরের সহিত মিলিত হতে আমাদের কর্মকে স্বার্থপরতা দোষমুক্ত করতে হবে, আমাদের সকলের জন্য কাজ করতে হবে। তাঁর ধারণায় যে কাজ কল্যাণ আনে তা সামান্য হলেও বিশ্বজনীন। এমন কাজই বিশ্বকর্মার আদর্শকে রূপায়িত করে, কারণ তিনি বিশ্বের জন্য কাজ করেন।[৪৪]

পরে রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা একটু পরিবর্তিত হয়ে সামান্য ভিন্নরূপ নিয়েছিল। তা বলে, বিশ্বজনীন কর্ম ত মানুষের প্রশস্ত ধর্ম বটেই, অতিরিক্তভাবে যে কর্ম দলিত, অবহেলিত শ্রেণীর মানুষের সেবায় লাগে তা আরও সার্থক, আরও আকর্ষণীয়। কারণ, তাঁর ধারণায় সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ ত আছেই, কিন্তু তাঁর যেন বিশেষ আকর্ষণ নীচের তলার মানুষের প্রতি, তাদের মাঝে তাঁর বিশেষ প্রকাশ। এই মনোভাব প্রণোদিত হয়েই তিনি বলেছেন

৪৪ 'All work that is good, however small in extent is universal in character. Such work makes for realisation of a Viswakarma, the world worker who works for all.'

Religion of Man, Spiritual Union.

যে ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনা বা মন্দিরে বসে বিগ্রহের সেবা এগুলি সার্থক উপাসনা নয়। কারণ দেবতা ত মন্দিরে আবদ্ধ নন, তিনি স্থান নিয়েছেন অবহেলিত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে :

অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নেই ঘরে।[৪৫]

এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বললেন, মন্দিরে দেবতাকে খোঁজা বৃথা, আনুষ্ঠানিক ধর্ম সার্থকতা মণ্ডিত হয় না, কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগই প্রকৃত ধর্মাচরণ :

'রাখোরে পূজা থাকরে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধূলা বালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরি'[৪৬]

ঈশ্বর ত মন্দিরে নেই, তিনি আছেন যারা দরিদ্র শ্রমজীবী তাদের মধ্যে, যাদের কঠোর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে দিন কাটে তাদের মধ্যে। তিনি আরও বললেন, শুধু শ্রমজীবী নয়, ঈশ্বর বিশেষ ক'রে স্থান নিয়েছেন যারা সর্বহারা তাদের মাঝখানে। কারণ তিনি দীনের সঙ্গী। রিক্ত, সর্বহারা, দীনদরিদ্র তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। তাই ধনে মানে যারা সুখে আছে, তাদের মধ্যে তাঁকে খোঁজা বৃথা। নীচের মহলের মানুষের দিকেই নজর দিতে হবে :

ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গী হীনের ঘরে

৪৫ গীতাঞ্জলি, ১১৯

৪৬ গীতাঞ্জলি, ১১৯

সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সবহারাদের মাঝে।[৪৭]

সুতরাং বিশ্বজনীন কর্ম নেবে উপাসনার স্থান এবং তার বিশেষ ক্ষেত্র হবে দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষ যেখানে পড়ে আছে সেখানে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত মানবিকতার বৈশিষ্ট্য। তা এমন একটি ক্ষেত্র নির্বাচন ক'রে নেয় যেখানে বিশ্বজনীন কল্যাণকর্মের সর্বাপেক্ষা সার্থক পরিণতি ঘটে। এই হ'ল রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার শেষ কথা, তাঁর সাধনজীবনের চরম উপলব্ধি। যে ভাবধারা কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়েছিল বিশ্বমানবের, বিশেষ ক'রে অবহেলিত মানবের সেবার বাণী শুনিয়ে।

উপরের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মানবিকতা তত্ত্ব, তার বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস সহ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। মোটামুটি তিনি বলেছেন মানুষের তিনটি মূল বৃত্তির যে ধর্মতত্ত্বে সমান ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব, তাই হ'ল আদর্শ ধর্ম। তাঁর মতে মানুষের ধর্ম হ'ল তাই যা মানুষের নিজস্ব প্রকৃতিকে বিকাশ করতে সাহায্য করবে। তা সম্ভব হয় তার তিনটি মৌলিক বৃত্তির যুগপৎ পরিবর্দ্ধনে। কাজেই তাঁর ধারণায় মতিগতির পথে যার যে পথ খুসি বেছে নিক, এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের মত, বা গীতায় প্রদর্শিত পথ তিনি গ্রহণ করেন নি। তিনি ধর্মের কাছে শুধু ধর্মবোধের তৃপ্তি দাবি করেন নি। তার কাছ হতে আরও অতিরিক্ত জিনিস আশা করেন। তিনি চেয়েছেন, তা মানুষের সকল সদ্বৃত্তির বিকাশ সাধন ক'রে তার সামগ্রিক কল্যাণ আনুক।

তাঁর এই দাবি যুক্তিসঙ্গত নয় ব'লে অস্বীকার করা যায় না।

৪৭ গীতাঞ্জলি, ১০৭

এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। নদীর জল বর্ষায় স্ফীত হয়ে সমুদ্রের দিকে ছোটবার পথে যদি নদীর বক্ষে স্থান খুঁজে না পায়, তা হলে বন্যা সৃষ্টি করে। তার কারণ এই বন্যার পিছনে এক শক্তি রয়েছে যা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে বেড়ায়। এখন যদি বলা হয় যে তা যেখান দিয়ে যে ভাবে পথ খুঁজে পাবে সেইখান দিয়েই তাকে যেতে দেওয়া হবে, তা হলে কেবল জলপ্রবাহের সমুদ্রপথে যাবার ব্যবস্থাই ক'রে দেওয়া হয়, অতিরিক্ত কিছু লাভ হয় না। অপরপক্ষে তা বন্যা সৃষ্টি করলে অনেক ক্ষতি হয়। এখন সেই বন্যার শক্তিকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে সংহত ক'রে নিয়ে, খাল কেটে দেশের অনুর্বর অংশে যদি প্রবাহিত করা যায়, তা হলে অতিরিক্ত লাভ হয়। নদীর জল তার নির্গমের পথ খুঁজে পায়, অতিরিক্তভাবে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত আকারে প্রবাহিত হয়ে তা দেশকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত না ক'রে শস্যমণ্ডিত করে।

মনে হয়, ধর্ম সমস্যা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এই ধরণের যুক্তিদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। মানুষের বিশ্বসত্তাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের ইচ্ছা একটি প্রচণ্ড শক্তি। তার তৃপ্তি সাধনের জন্যই নানা উপাসনা রীতির উদ্ভব। কিন্তু কেবল তৃপ্তি সাধনের মধ্যেই যদি আমাদের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ রাখি, তা হলে তা শুধু অনিয়ন্ত্রিত থেকে যায় না, তার অতিরিক্ত কোনো ব্যবহার থাকে না। অপরপক্ষে উপাসনার রীতি যদি এমন ভাবে নির্বাচন করা যায়, যাতে শ্রদ্ধা নিবেদনের ইচ্ছার তৃপ্তি সাধন হয়ে অতিরিক্তভাবে মানুষের মূল বৃত্তিগুলির বিকাশ ঘটে, তা হলে অতিরিক্ত লাভ হয়। একটি প্রচণ্ড শক্তিকে শৃঙ্খলিত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে এইভাবে সকল মানুষের কল্যাণসাধনে নিয়োগ করা যায়। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার বৈশিষ্ট্য।

৭

এখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত মানবিকতার সঙ্গে অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীর মানবিকতার সম্পর্কিত চিন্তার তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি। তাতে দুটি লাভ আছে। প্রথমত এই ধরণের আলোচনার ফলে তাঁর নিজের তত্ত্বটিকে আরও ভালো ক'রে বোঝা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত এই আলোচনার ফলে তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্বের উৎকর্ষ কোথায় তা ভালো ক'রে হৃদয়সঙ্গম হবে।

আমরা প্রথমেই তাঁর প্রবর্তিত মানবিকতার সহিত ফরাসী দার্শনিক কোঁত-এর মানবিকতার তুলনা করতে পারি। তাঁর দর্শনের নাম অনুসারে আমরা একে নৈশ্চিত্তিক মানবিকতা[৪৮] বলতে পারি। কোঁত-এর মানবিকতা-তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই নিবন্ধের গোড়ায় দেওয়া হয়েছে। কাজেই তার পুনরুল্লেখ এখানে নিস্প্রয়োজন। তাঁর দর্শনের বৈশিষ্ট্য বেশ সুস্পষ্ট। তাঁর ধারণায় বিশ্বের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তিতে সম্ভব নয়। সে চেষ্টায় যা পাওয়া যায় তা কল্পনাভিত্তিক এবং সেই কারণে নির্ভরযোগ্য নিশ্চিত তথ্যসংগ্রহ করতে তা অক্ষম। কেবল একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে মানুষ নির্ভরযোগ্য তথ্যসংগ্রহের ক্ষমতা রাখে। তা হ'ল প্রত্যক্ষ জগতের কার্যকারণ সম্বন্ধে সংযুক্ত রীতির দ্বারা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

মৌলিক সত্তা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-আহরণে অক্ষমতা হতেই তাঁর মানবিকতাবাদের উৎপত্তি। ফলে ধর্মে ও দর্শনে তিনি আস্থা হারিয়েছিলেন এবং তাই ধর্মচিন্তায় ঈশ্বরের কোনো স্থান আছে বলে স্বীকার করতে পারেন নি। অপর পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদনের এবং সেবার একটি পাত্র নির্বাচনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সুতরাং তাঁর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঈশ্বরের শূন্য আসনে কাকে স্থাপন করা হবে এই। তিনি ঠিক করলেন মানুষকে সেই আসনে বসানো হ'ক। মানুষকে

৪৮ Positivistic Humanism

অভিবাদন করলেন 'মহান সত্তা'[৪৯] বলে। অতিমানবকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সাধারণ মানুষের সেবাই হ'ল তাঁর মানবিকতার মূলনীতি। তা ঈশ্বর হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; সেখানে ঈশ্বরকে নির্বাসিত ক'রে মানুষকে তাঁর স্থানে বসানো হয়েছে।

তাঁর এই পরিকল্পনায় যেমন গুণ আছে তেমন দুর্বলতাও আছে দেখা যায়। ঈশ্বরকে তিনি নির্বাসিত করলেন এই ধারণায় যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় না, তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় না। ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের পরিকল্পনা হয়ত যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা শক্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু একটি প্রচ্ছন্ন মহাশক্তি যে সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত ক'রে নিয়ন্ত্রণ করছেন এ বিষয় অনিশ্চিত মনোভাব পোষণ করবার কোনো সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। কবি ও দার্শনিক যে এই প্রতিপাদ্য সমর্থন করেন সে কথা নাই ধরলাম। বৈজ্ঞানিক যে তার সমর্থন করেন না এমন বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন-এর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি এই ধরণের একটি নৈর্ব্যক্তিক মহাসত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁকেই ঈশ্বর বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার উৎকর্ষ এই যে তা মানুষকে কার্য-কারণ সম্বন্ধের ভিত্তিতে নানা ব্যাপার বুঝতে সাহায্য করে এবং মনকে কুসংস্কারমুক্ত করে। উচ্চতর বৈজ্ঞানিক চিন্তার পেছনে মর্মানুভূতির সগোত্র এই ধরণের একটি বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে বিশ্ব বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁর ধারণায় বিশ্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হতে একটি উচ্চস্তরের মনের প্রচ্ছন্ন প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই ধারণাকে সর্বেশ্বরবাদ ব'লে বর্ণনা করেছেন।[৫০]

৪৯ Grand etre

৫০ 'This firm belief, a belief bound with deep feeling, in a superior mind that reveals itself in the world of experience represents my conceptions of God. In common parlance, it may be described as pantheistic.

Ideas and Opinions, Scientific Truth

কোঁত-এর মানবিকতার কি উৎকর্ষ তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। উপাসনা বা বিগ্রহের সেবা ও পূজায় যে সময় ও সামর্থ্য অতিবাহিত হয় তা কেবল ভক্তের হৃদয়বৃত্তি ও সেবাবৃত্তির তৃপ্তি সাধন করে, তার অতিরিক্তভাবে মানুষের কোনো কল্যাণসাধন করে না। এই ভাবে তার সার্থকতার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। বিগ্রহ ও ঈশ্বরের সেবার পরিবর্তে যদি মানবজাতির সেবাকে ধর্ম আচরণের রীতি ব'লে গ্রহণ করা যায় তা ব্যাপক ক্ষেত্রে কল্যাণধর্মী হয়ে সার্থক হয়ে ওঠে।

অপরপক্ষে কোঁত-এর মানবিকতার দুর্বলতা এসে গেছে ঈশ্বরকে একেবারে বর্জন ক'রে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নিবেদন এবং তাঁকে সেবা করবার আকৃতি একটি মৌলিক আকৃতি। তার শক্তি প্রচণ্ড। তা প্রাকৃতিক শক্তির সহিত তুলনীয় এবং অসাধ্য সাধন করবার ক্ষমতা রাখে। তাঁর আদর্শ ঈশ্বরকে বর্জন ক'রে সেই প্রচণ্ড শক্তির সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগের যে ইচ্ছাশক্তি তা দুর্বল হয়ে পড়ে। ঈশ্বরকে সেবা করছি এই জ্ঞানেই যদি মানুষকে সেবা করছি বলা হ'ত তা হলে ধর্মবৃত্তির সঙ্গে এই আদর্শের সংযোগ সাধিত হয়ে তাকে আরও শক্তিশালী করতে পারত।

ভারতীয় দর্শনে কোঁত-এর মানবিকতার সঙ্গে বুদ্ধের আদর্শের খানিকটা তুলনা চলতে পারে। তাদের ঐক্য এইখানে যে উভয়েই ধর্ম হতে ঈশ্বরকে বর্জন করেছেন। তবে বুদ্ধের আদর্শ আরও ব্যাপক। তা বলে শুধু মানুষ নয়, সকল জীবের প্রতি প্রীতি বহন ক'রে তাদের সেবা করাই প্রকৃত ধর্মরীতি। তাঁর স্থাপিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে সংযম, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি নৈতিকগুণের চর্চার নির্দেশ ত আছেই। অতিরিক্তভাবে সর্বজীবে প্রীতি ও সেবার নির্দেশ আছে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের একটি অঙ্গ হ'ল সম্যক কর্ম। অহিংসা ও প্রাণী হত্যায় বিরত থাকা তার প্রধান অঙ্গ। তিনি যা প্রচার করেছিলেন তা শুধু হিংসাবৃত্তি দমন নয়, তার থেকে অনেক বেশি। সংক্ষেপে বলা যায় সকল জীবকে ভালোবেসে, সকলের মঙ্গল কামনা ক'রে, সর্বজনীন

কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতেই তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি মানবিকতাকে বিস্তারিত ক'রে সর্বজীব-হিতৈষণায় রূপান্তরিত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ত্রিপিটক হতে একটি বচন উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"আমাদের মন চঞ্চল হবে না, কুকথা আমরা উচ্চারণ করব না, গুপ্ত বিদ্বেষকে বর্জন করে, আমরা হৃদয়ে কোমল ও সহানুভূতিসিক্ত ভালোবাসা পোষণ করব। আমাদের প্রেমময় চিন্তার কিরণে তাঁকে আপ্লুত করে আমরা তাঁর কাছ হতে যাত্রা করব এবং সমগ্র বিশ্বকে বহুদূর প্রসারী মহান ও অপরিমেয় প্রেম দ্বারা আপ্লুত করব।"[৫১]

এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ বুদ্ধের যেমন মনীষা ছিল তেমনি হৃদয়-বৃত্তি প্রবল ছিল। সম্ভবত হৃদয়বৃত্তি তাঁর জীবনে মূল প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল। তাঁর হৃদয় ছিল করুণায় ভরা। সেই কারণে সে কালের মানুষ তাঁকে পরম কারুণিক মহর্ষি নামে ভূষিত করেছিল। মানবজাতির জীবনে আধি ব্যাধি জরা মৃত্যুর উপস্থিতি তাঁর মনে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল ব'লেই রাজ্যের সম্পদ ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য দুঃখ হতে মুক্তির উপায় খুঁজেছিলেন। ফলে যে নূতন ধর্ম গড়ে উঠেছিল তা ঈশ্বরকে অস্বীকার ক'রেও দয়া ও প্রেমের প্রভাবে সর্বজীবহিতৈষণা ব্রত প্রচারে তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এই কারণে বুদ্ধের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। নীচে উদ্ধৃত তাঁর মন্তব্য তার সমর্থন করবে :

"আমি সেই গৌতমবুদ্ধের ন্যায় চরিত্রশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না; যিনি এই সম্বন্ধে কখনও প্রশ্ন করেন নাই, এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা

৫১ মজ্‌ঝিম নিকায়

জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন অপরের হিত কিসে হয়, ইহাই যাঁহার চিন্তা ছিল।[৫২]

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার সহিত এই দুই মনীষীর প্রবর্তিত মানবিকতার এখন তুলনা করা যেতে পারে। বুদ্ধ এবং কোঁত উভয়েই তাঁদের মানবিকতার আদর্শে ঈশ্বরকে বর্জন করেছিলেন। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে গ্রহণ ক'রে তাঁর মানবিকতা গড়ে তুলেছেন। তিনি বল্লেন মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ, তাঁর ত পৃথক প্রকাশ নেই; কাজেই মানুষের কল্যাণসাধন করাই ঈশ্বর পূজার সমস্থানীয়। তিনি মানবসেবাকে ঈশ্বরের সেবার মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। দ্বিতীয়ত বুদ্ধের আদর্শের সঙ্গে তাঁর আদর্শের একটি অতিরিক্ত পার্থক্য আছে। বুদ্ধ সকল জীবকে সেবা করতে বলেছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানুষকে বিশেষ সেবার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে বলেছেন। কারণ তাঁর ধারণায় জ্ঞান, প্রীতি ও কর্মবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশসাধন মানুষকে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠতম প্রকাশ হিসাবে গ্রহণ করেই সম্ভব। ইতর জীবের সহিত প্রীতির আদানপ্রদান তেমন পূর্ণমাত্রায় সম্ভব নয় যেমন মানুষের সহিত; সেখানে তার ক্ষেত্র একান্তই সংকুচিত।

৮

উপনিষদের চিন্তায় যে মানবিকতার বিকাশ ঘটেছিল তার প্রকৃতি অনন্যসাধারণ। তা এক দিকে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে যেমন গ্রহণ করে নি, তেমন ধর্মকে মানবিকতার পরিকল্পনা হতে বর্জনও করে নি। সুতরাং উপনিষদের মানবিকতার সহিত রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার তুলনা করলে তাঁর আদর্শকে আরও ভালো রকম বুঝতে সাহায্য করবে।

উপনিষদের ঋষির প্রেরণা ছিল হৃদয়বৃত্তি নয়, বুদ্ধিবৃত্তি; ভক্তি নয়, জ্ঞানপিপাসা। ব্রহ্মকে জানবার দুর্বার কৌতূহল তাঁদের বিশ্বের মৌলিক

৫২ জ্ঞানযোগ

সত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে উৎসাহিত করেছিল। সত্যকে জানবার জন্য তাঁরা উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই তাঁদের প্রার্থনা বাণী ছিল ভক্তি নিবেদন নয়, ধী শক্তি, পরমসত্তা যেন তাঁদের এমন ধী শক্তি দেন যাতে তাঁর বরেণ্য ভর্গ তার দ্বারা গ্রহণ করতে পারেন। 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'। এই পথে অগ্রসর হয়ে তাঁরা ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বরকে খুঁজে পান নি। তাঁরা পেয়েছিলেন এক অব্যক্ত শক্তির পরিচয় যার পৃথক সত্তা রূপে কোনো প্রকাশ নেই। তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান। বিশ্বে যা কিছু আছে সব জড়িয়ে তিনি আছেন। তিনি সব কিছু ব্যাপ্ত ক'রে আছেন। তিনি এক নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। তাই তাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। যিনি সব থেকে বিরাট, সব কিছু ব্যাপ্ত ক'রে আছেন, তিনিই ত ব্রহ্ম। সুতরাং উপনিষদে যে দর্শন গড়ে উঠেছে তা সর্বেশ্বরবাদ। বিশ্ব সত্তা তার পরিকল্পনায় ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট নয়, তা নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বের নিয়ন্ত্রক এবং ধারক মহাশক্তি।

উপনিষদের মানবিকতা এই সর্বেশ্বরবাদকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বিশ্বের সকল বস্তু যে একই মহাসত্তার প্রকাশ এই বোধই উপনিষদের নীতির মূল প্রেরণা। যেহেতু সেখানে হৃদয়বৃত্তি প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল না, জ্ঞানপিপাসাই চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেখানে ঈশ্বরকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা নিবেদনের কোনো ইচ্ছা লক্ষিত হয় না। ভক্তির থেকে পরম সত্তার প্রকৃতি আলোচনাই সেখানে বড় আকর্ষণ। কাজেই সেখানে আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি কোনো অনুরাগ লক্ষ্য করা যায় না। এখানেই মূল বেদের সহিত তার পার্থক্য। সেই কারণেই বেদের সংহিতা অংশকে কর্মকাণ্ড বলা হয় এবং উপনিষদ অংশকে জ্ঞানকাণ্ড বলা হয়।

নীতির ক্ষেত্রে এক মূল সমস্যা হ'ল মানুষের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব। প্রতি মানুষই নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, কাজেই স্বভাবতই নিজের স্বার্থ সংরক্ষণে বেশী নজর দেয়।

এই ভাবে স্বার্থের সহিত পরার্থের সংঘাত নীতিশাস্ত্রে একটি মৌলিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

উপনিষদে এই সমস্যার সমাধান খোঁজা হয়েছে এক বিচিত্র পথে। এই পরিকল্পনায় বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে বিভিন্ন ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। গীতা বা কাণ্ট-এর মত হৃদয়বৃত্তিকে বর্জন করা হয় নি। তাদের পরস্পর পরিপূরক ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক ভূমিকা হৃদয়বৃত্তির আর প্রেরণা দেবার ভূমিকা বুদ্ধিবৃত্তির। ব্যবস্থাটি সত্যই অভিনব। সুতরাং সহজবোধ্য করবার জন্য একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। মোটকথা উপনিষদ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্দ্ধন চেয়েছে এবং হৃদয় বৃত্তির প্রসারের সাহায্যেই স্বার্থ এবং পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছে।

এখন মানুষের হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ পাই স্নেহ, প্রীতি ও ভালোবাসার বিস্তারে। সেই ভালোবাসাকে বিস্তার করেই স্বার্থ পরিশোধিত হতে পারে। সেটা সম্ভব ; কারণ সকল মানুষের মধ্যেই স্বার্থ এবং পরার্থবোধ দুইই ক্রিয়াশীল। এমন কি সাধারণ মানুষও বিশেষ ক্ষেত্রে স্বার্থত্যাগ সহজেই করতে পারে এবং পরার্থে অনেক আত্মত্যাগ স্বীকার করতে পারে। সন্তানের জন্য এমন ত্যাগ নেই যা মা করতে প্রস্তুত নয়, প্রিয়জনের জন্য প্রেমিক স্বার্থত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করবে না।

কেন এমন হয়? তার উত্তর হল এই সব জায়গায় ব্যক্তির স্বার্থ সংকুচিত ক্ষেত্র অতিক্রম ক'রে অন্যের স্বার্থকে নিজের ক'রে নিয়েছে। মা যখন সন্তানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন তাঁর কষ্টবোধ হয় না ; কারণ সন্তানের স্বার্থ তাঁর স্বার্থের সহিত একীভূত হয়ে গেছে। প্রেমিক যখন প্রেমাস্পদের জন্য আত্মত্যাগ স্বীকার করে তখন প্রেমাস্পদের স্বার্থ তার নিজের স্বার্থের অধিক প্রিয় হয়ে উঠেছে। এমন হয়, তার কারণ এদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থনে একটি সচরাচর দৃষ্ট উদাহরণ

ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনো একটি ছোট মেয়েকে হয়ত ভালোবেসে কেউ কতকগুলি লজেঞ্জ উপহার দিয়েছেন। প্রতিবেশী বালকবালিকারা যদি এসে ভাগ চায়, বলে, 'একটা দেনা', সে হয় ত দেবে না। কিন্তু বাড়ীতে এসে ভাইবোনেদের মধ্যে না চাইলেও নিজ হতেই তা ভাগ ক'রে দেবে। এই আচরণের ভিন্নতার কারণ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ নেই, তাদের সে আপনজন মনে করে না, আর পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ আছে বলেই তাদের আপনজন মনে করে। সেই কারণেই তাদের সহিত ভাগ ক'রে ভোগ করতে তার কোনো বাধা আসে না।

উপনিষদ এই পথেই স্বার্থ ও পরার্থের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করেছে। তা বলে বিশ্বের সকল জীব সকল বস্তুকে ব্যাপ্ত ক'রে একই মহাসত্তা প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান। সুতরাং সকলেই সকলের আত্মীয়। সকল মানুষ একই পরিবারে সন্তানের মত। কাজেই সকলেই সকলকে ভালোবাসবে এবং প্রীতি করবে। এই একত্ববোধ হতে এই ভাবে সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বোধ যখন পরিস্ফুট হবে তখন সকলের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্বভাবতই গড়ে উঠবে। ফলে স্বার্থের সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

এখন আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে দু-একটি বচন এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলেছেন জায়ার নিকট যে পতি প্রিয় হয় তা পতির কারণে নয়, পতির নিকট যে জায়া প্রিয় হয় তা জায়ার কারণে নয়, মাতার নিকট যে পুত্র প্রিয় হয় তা পুত্রের কারণে নয়। তিনি বলেছেন, তারা প্রিয় হয় তার কারণ সকলকেই ব্যাপ্ত ক'রে একই আত্মা বর্তমান আছেন।[৫১]

৫১ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ইত্যাদি ॥

বৃহদারণ্যক ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬

ঈশ উপনিষদে এই তত্ত্বটি অবলম্বন ক'রে সকল মানুষকে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সকলেই একই মহান সত্তার অঙ্গ সকলেই সকলের ভাই বোনের মত। সুতরাং স্বার্থপরের মত একাকী সম্পদ ভোগ করবার কোনো অর্থ হয় না। তাই পরস্পর ভাগ করে ভোগ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যুক্তি হল 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্', বিশ্বে যা কিছু আছে সবই এক মহাসত্তা দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সুতরাং উপদেশ দেওয়া হয়েছে 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'; পরস্পর ভাগ ক'রে ভোগ করবে। 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'; কারও ধন অপহরণ করবে না।

এই উপলব্ধিকে ভিত্তি করেই উপনিষদের মানবিকতা গড়ে উঠেছে। তার পরিণত রূপে তা বলে মানুষের তিনটি মৌলিক কর্তব্য পালন করা উচিত। তা হল দম, দান এবং দয়া। বিষয়টি বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি সুন্দর গল্পের সূত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেবার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে গুরু সমাবর্তনের দিনে শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন—আত্মদমন করবে, দান করবে, দয়া করবে। এই গুরু যে-সে গুরু নন স্বয়ং ব্রহ্মা। তাই এক কাব্যময় ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যে এই মহান উপদেশের প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে ও সর্বকালে; তাই জন্যই নাকি প্রতি বছর মেঘে ঢাকা দিনে স্তনয়িত্নু বজ্ররবে ঘোষণা করে 'দ দ দ'। অর্থাৎ বলতে চায় ওগো বিশ্ববাসী তোমরা স্বার্থকে, বিদ্বেষকে, ক্রোধকে দমন কর, নিজের সম্পদ অন্যকে দান কর এবং পীড়িতকে, দুর্ভাগাকে দয়া কর, তার সেবা কর।[৫২]

এই হল সংক্ষেপে উপনিষদের মানবিকতা। ঈশ্বরের ব্যক্তিজ্ঞানে সেবা করার প্রশ্ন এখানে ওঠে নি। তবে নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বরের এখানে একটি মুখ্য ভূমিকা আছে। তিনি মানুষে মানুষে সম্বন্ধ সূত্র হিসাবে

৫২ তদেতদেবৈষা দৈবী বাক্ বদতি স্তনয়িত্নু র্দ দ দ ইতি দামত্য দত্ত দয়ধবমিতি তদেৎ ত্রয়ং শিক্ষেদ্ দমং দানং দয়ামিতি। বৃহদারণ্যক ॥৫॥২॥৩

বর্তমান। এই বোধকে অবলম্বন ক'রে পারস্পরিক প্রীতিকে ভিত্তি ক'রে এই মানবিকতা গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সহিত তার খুব পার্থক্য নেই। তা সুন্দর বোঝা যায় তাঁর রচিত নীচে উদ্ধৃত কাব্যাংশ হতেঃ

ভাই যে তুমি ভাইয়ের মাঝে, প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ করে মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরি নে।[৫৩]

এখানে যেন ঈশ উপনিষদের বচনের প্রতিধ্বনি পাই। উপনিষদের মানবিকতার সহিত রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার এইটুকু পার্থক্য যে তিনি সর্বেশ্বরবাদকে স্বীকার করেও অতিরিক্ত ভাবে এক ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর মানবিকতা মানুষের ধর্মচেতনার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। ঈশ্বরে ভক্তি তার একটি মূল প্রেরণা। উপনিষদের মানবিকতায় সে প্রেরণা নেই, কারণ তা ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের সন্ধান পায় নি। তার মানবিকতাবোধের ভিত্তি হল ঈশ্বরের নৈর্ব্যক্তিক সত্তা হিসাবে সর্বব্যাপিত্ববোধ হতে মানুষের মধ্যে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতার উপলব্ধি।

৯

আধুনিককালে যে নূতন মানবিকতার আমাদের দেশে জন্ম হয়েছে তাকে আমরা পাই স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শের মধ্যে। রামকৃষ্ণ মিশনের নানা কল্যাণ-প্রতিষ্ঠান ও সেগুলিকে যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় পরিচালিত করেন তাঁরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাঁদের কর্মনৈপুণ্য, স্বার্থলেশহীন পরার্থে নিবেদিত জীবন এবং জনকল্যানে সুগভীর অনুরাগ এই প্রতিষ্ঠানগুলির

৫৩ গীতাঞ্জলি, ৯২

আদর্শ সেবা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে খ্যাতি এনে দিয়েছে। বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, চিকিৎসালয়, পাঠাগার, সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রভৃতির রূপ নিয়ে তাঁদের কর্মসাধনা আত্মপ্রকাশ করেছে। এমন নিবেদিত-প্রাণ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গড়ে উঠত না যদি না তাঁরা বিবেকানন্দ প্রবর্তিত মানবিকতার ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেন। ভারতবর্ষ চিরকালই সাধু সন্ন্যাসীর দেশ। সংসার ত্যাগ ক'রে অধ্যাত্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করবার মানুষের এখানে কোনো দিনই অভাব হয় নি। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের সহিত তাঁদের একটি পার্থক্য আছে। সাধারণ সন্ন্যাসী সমাজকে বর্জন ক'রে নিজের সাধনায় মগ্ন থাকেন। অপরপক্ষে মিশনের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সংসার ত্যাগ করেছেন নিশ্চিত, কিন্তু সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হন নি। সমাজসেবাও তাঁদের সাধনার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। বিবেকানন্দ প্রবর্তিত মানবিকতার প্রভাবেই তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে এবং তার ফলেই তাঁরা এমন কর্মদক্ষ, ন্যায়পরায়ণ, জনসেবায় উন্মুখ কল্যাণব্রতী হয়ে গড়ে উঠেছেন।

এখন রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার সহিত বিবেকানন্দ প্রবর্তিত মানবিকতার তুলনা করা যেতে পারে। তার একটা বিশেষ প্রয়োজনও আছে। উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন এবং নিজ নিজ মতিগতির পথে সাধনজীবনে অগ্রসর হয়েছিলেন। আমরা দেখব, পরিবেশের প্রভাবেই হক, আর মতিগতির প্রভাবেই হক, তাঁদের সাধনজীবন শুরু হয়েছিল ভিন্ন পথে, কিন্তু পরিণতিতে তাঁরা একই ধরণের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এই কারণে তাঁদের মানবিকতার তুলনামূলক আলোচনা চিত্তাকর্ষকও হবে সন্দেহ নেই।

প্রথম জীবনে দেখি ভারতের এই দুই বিশিষ্ট সন্তানের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গভীর পার্থক্য বর্তমান ছিল। বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করলে তা সুন্দর হৃদয়ঙ্গম হবে। বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সংসারী। তিনি বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি

খোঁজেন নি বা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ ক'রে যোগাসনে বসবার আকর্ষণ অনুভব করেন নি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের মধ্যেই পরম সত্তার সহিত সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ঠিক বলতে কি, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

সেটি সুন্দর বোঝা যায় শংকরাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত হতে। অদ্বৈতবাদ বলে বিশ্ব জুড়ে একটি মাত্র সত্তা বর্তমান আছেন এবং তাঁর প্রকৃতি চিন্ময়। তাঁর মধ্যে দ্বৈতভাবের কোনো অবকাশ নেই। কেবল চৈতন্যময় ব্রহ্ম আছেন, কিন্তু সেই চৈতন্যকে প্রতিফলিত করতে কোনো জ্ঞেয় বস্তু নেই। তা হলে কি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যে রূপ-রস-শব্দ-বর্ণ-গন্ধে বিচিত্র সত্তা বিশিষ্ট বিশ্বের পরিচয় এনে দেয়, তাদের সেই সাক্ষ্যকে আমরা গ্রহণ করব না? শংকরাচার্য একরকম বলেন তাই করা উচিত। মায়ার বিভ্রান্তিকর শক্তির প্রভাবে যা একক সত্তা তাকে ভুল ক'রে বহু দেখি। বিশ্ব ব্রহ্ম হতে পৃথক নয়, তবে তাঁকে যে বহুরূপে দেখি তা তাঁর সত্যরূপের পরিচয় নয়। তাঁর বহুত্ব স্বপ্নের মত অলীক।

আমরা দেখি শংকরাচার্যের এই অদ্বৈতবাদকে বিবেকানন্দ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছেন। ঠিক বলতে কি তিনি এই ব্যাখ্যার প্রচারকে জীবনের বিশেষ ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির মূল বিষয় ছিল এই ব্যাখ্যা। তাঁর রচিত একটি কবিতার প্রথম স্তবকের মধ্যে অদ্বৈতবাদের দ্বিধাহীন স্বীকৃতির সুন্দর স্বাক্ষর পাওয়া যায়। তা অতি সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদের মর্মকথা শোনায়। তা বলে:

> এক মাত্র মুক্ত জ্ঞাতা আত্মা হয়,
> অনাম, অরূপ, অক্লেদ নিশ্চয়;
> তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
> দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া।[৫৪]

৫৪ জ্ঞানযোগ

অদ্বৈতবেদান্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মুখ্যত কবি, অনুভূতি বৃত্তি তাঁর বিশেষ প্রবল। পরম সত্তার দ্বৈতভাব বিহীন নিঃসঙ্গ একাকিত্ব তিনি কিছুতেই স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি। যে তত্ত্ব বিশ্বের মধ্যে দ্বৈতভাবকে স্বীকার করে না, তা বড় নীরস; সেখানে দুয়ের মধ্যে জানাজানি নেই, সেখানে ভালোবাসবার বা ভক্তি করবার পাত্র নেই, সেখানে হৃদয়বৃত্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র নেই। এমন কি ঈশ্বরের সহিত ভক্তির সূত্রে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপনেরও সুযোগ নেই। এই কারণেই অদ্বৈতদর্শনের বিশ্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মতিগতির সঙ্গে তা সংগতি রক্ষা করে না। তাই দেখি তাঁর কাব্যে, তাঁর বিভিন্ন রচনায় নানা যুক্তি দিয়ে এই ব্যাখ্যার তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ বিষয় বর্তমান প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেবল অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব পরিস্ফুট করবার জন্য তাঁর একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে:

হারে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণ জরা,
বহি বিজ্ঞতার বোঝা ভাবিতেছ মনে—
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।
লয়ে কুশাঙ্কুর বুদ্ধি শাণিত প্রখরা
কর্মহীন রাত্রি দিন বসি গৃহ কোণে
মিথ্যা বলে জানিয়াছ বিশ্ব বসুন্ধরা—
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।[৫৫]

অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে পরিণতিতে তাঁদের সাধনা বিপরীত পথে যাত্রা শুরু করে ও একই স্থানে গিয়ে মিলেছিল। উভয়েরই সাধনজীবনের পরিণত চিন্তার ফল হল এমন এক ধরণের মানবিকতা যা উভয়েই গ্রহণ করতে প্রস্তুত। রবীন্দ্রনাথের মানবিকতার সহিত আমরা ইতিমধ্যে সবিস্তারে পরিচিত হয়েছি। সুতরাং তার নূতন ক'রে

৫৫ সোনার তরী, মায়াবাদ

আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। আমরা এখন সংক্ষেপে অদ্বৈতবাদে অচল বিশ্বাস রেখেও কেমনে বিবেকানন্দ ধীরে ধীরে তাঁর নিজস্ব মানবিকতা তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারি।

আপাতদৃষ্টিতে বিবেকানন্দ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হলেও, বেদান্ত দর্শনে ঐকান্তিকভাবে অনুরাগী হলেও, তাঁর হৃদয়বৃত্তিও খুবই প্রবল ছিল। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে দার্শনিক চিন্তার প্রতি প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করলেও তাঁর হৃদয়বৃত্তিকে নিস্তেজ করতে পারে নি। তাঁর মনে-দয়া মায়া বোধ, দারিদ্র অবহেলিত মানুষের প্রতি করুণাবোধ এবং অবনত দেশবাসীর জন্য হৃদয় ভরা ভালোবাসা তাঁর জীবনের ওপর কম প্রভাব বিস্তার করে নি। মনের এই দুই বিপরীত অংশ কেহ কারও উপর একাধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি এবং ফলে পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে তাঁর সাধন-জীবনকে পরিণতির পথে এগিয়ে দিয়েছে। এই দুই বিপরীত শক্তির সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়েই তাঁর মানবিকতা বিকাশ লাভ করেছে।

তাই দেখি অদ্বৈতবেদান্তের বিশুদ্ধ একত্ববাদের গলায় বরমাল্য দিয়েও তিনি হৃদয়বৃত্তির দাবিকে অস্বীকার করতে পারেন নি। বিশ্ব যদি প্রপঞ্চময় হয়, তা যদি স্বপ্নের মত অলীক হয়, তা হলে মানুষের দুঃখ কষ্ট ভোগও ত অলীক। কিন্তু বুদ্ধি যা বলেছিল হৃদয়বৃত্তি তাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারে নি। সেই জন্য তিনি একটি দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন। সেই দোটানার সমাধানের একটি পথও তিনি গভীর চিন্তার পর আবিষ্কার করেছিলেন। ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে জীবজন্তু, মানুষ নিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বকে ঠিক প্রপঞ্চ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তা ব্রহ্মাতেই অবস্থিত, তা ব্রহ্ম হতেই উদ্ভূত; সুতরাং তাও সত্য। তারা ব্রহ্মেরই প্রকট প্রকাশ। কাজেই মানুষের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ হৃদয়বৃত্তির অপচয় নয়। তার সার্থকতা আছে।

এই ভাবে হৃদয়বৃত্তির প্রভাবে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ বিবেকানন্দের হাতে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করল। তিনি বললেন, বিশ্বে যা কিছু দেখি তা ত মায়ার প্রভাবে একক মূল সত্তার বিকৃত রূপ নয়। যা দেখি, যা শুনি, যা অনুভব করি সবই ত তাঁরই প্রকাশ। সুতরাং বলা যায় তারা স্বয়ং বিশ্বনাথের প্রকট রূপ। পতি-পত্নী, সন্তান সন্ততি, পশু-পক্ষী সব কিছুর মধ্যেই তিনি প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজমান। শুধু তাই নয়, তাঁর ধারণা, বিশ্বসত্তা সব কিছু পরিব্যাপ্ত ক'রে থাকলেও মানুষের নিকট তাঁর বিশেষ প্রকাশ মানুষ রূপেই। ভাবতে সত্যই আশ্চর্য লাগে রবীন্দ্রনাথও পরিণতিতে ঠিক অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং উভয়ক্ষেত্রেই তাঁদের মানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই উপলব্ধিকে ভিত্তি করে।

এ বিষয় আলোচনার আগে বিবেকানন্দের যে উপলব্ধির কথা এখনি বলা হল তার সমর্থনে তাঁর নিজস্ব কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্থাপন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে তার নীচে উদ্ধৃত উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তিনি আপনাকে সমুদয় প্রাণীর ভিতর অভিব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু মানুষের মধ্যে তিনি মানুষের ভিতরেই প্রকাশিত।"[৫৬]

এই উপলব্ধির ফলে অদ্বৈতবেদান্তকে আশ্রয় করে তাঁর নিজের প্রবর্তিত ব্যবহারিক বেদান্তের জন্ম হল। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর জীবন ভজন-পূজন সাধনেই সীমাবদ্ধ রইল না, বিশ্বমানবের সেবা ও কল্যাণসাধন হয়ে পড়ল রামকৃষ্ণ আশ্রমের সন্ন্যাসীর সাধনার এক মৌলিক অঙ্গ। তা বিবেকানন্দের এই উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত :

"বেদান্ত বলেন এইরূপ কার্য কর—সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, সকলেতেই তিনি আছেন জন্য আমার জীবনকেও ঈশ্বরাণুপ্রেরিত, এমন কি ঈশ্বররূপ চিন্তা কর—জানিয়া রাখ ইহাই কেবল আমাদের কর্তব্য,

৫৬ ভক্তিরহস্য

ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা—কারণ ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আমরা কোথায় যাইব?"[৫৭]

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি করেই বিবেকানন্দের দর্শনে মানবিকতার জন্ম হয়েছিল। সকল জীবের মধ্যেই যখন ঈশ্বরের প্রকাশ এবং মানুষের মধ্যে মানুষের জন্য তাঁর বিশেষ প্রকাশ, তখন বিশ্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগ ঈশ্বরসেবারই সমস্থানীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিই পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে আদর্শসমাজকর্মী রূপে সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সুতরাং বিবেকানন্দের মানবিকতা উপদেশ দেয়. মানুষের মধ্যে মানুষের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ উপলব্ধি করে বিশ্বমানবের সেবাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করে নিতে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের পরিণত মতের সহিত তাঁর এই সিদ্ধান্তের আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য দেখা যায়। আরও আশ্চর্যের কথা দুজনে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রথম জীবনে ভিন্ন পথে সাধনা শুরু করেও পরিণতিতে একই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন। মানবিকতার জয় ঘোষণায় উভয়ের কণ্ঠ মিলিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথমত উভয়ের মানবিকতা ধর্মবোধের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত। উভয় ক্ষেত্রেই মানবিকতা ঈশ্বরকে বর্জন না করে, গ্রহণ করে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত মানুষের মধ্যে উভয়েই ঈশ্বরের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ আবিষ্কার করেছেন এবং সেই উপলব্ধিকে ভিত্তি করে মানবজাতির সেবাকে ঈশ্বর সেবার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উভয়েই দরিদ্র, নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের সেবার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেছেন। তৃতীয়ত লক্ষ্য করা যেতে পারে যে উপনিষদের ভাবধারায় বিকশিত যে মানবিকতা পাই, তা হতে যেন এই দুই মনীষীর পরিকল্পিত মানবিকতা পৃথক এবং পরস্পরের আরও নিকটতর।

৫৭ জ্ঞানযোগ

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরবঙ্গ

আকস্মিক ঘটনা জীবনের উপর অনেক সময় গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে, এমনকি জীবনকে নূতন পথেও পরিচালিত করে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের একটি আকস্মিক শোকাবহ ঘটনা পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মহর্ষি তাঁর জমিদারির ভালোরকম তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রীতিমত অবহিত ছিলেন। কারণ পৈতৃক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান কার-টেগোর কোম্পানির পতনের পর তার উপরেই দ্বারকানাথের উত্তরপুরুষের ভরণপোষণের জন্য নির্ভর করতে হত। কিন্তু মহর্ষির পক্ষে তত্ত্বাবধানের ভার নিজে নেওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ তিনি ব্রাহ্মধর্ম ও নিজ আধ্যাত্মিক সাধনা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পর তিনি বেশির ভাগ সময় উত্তর-পশ্চিমে হিমালয় অঞ্চলে সাধন ও উপাসনায় কাটিয়ে দিতেন। দীর্ঘ সময় পরে মাঝে মাঝে বাড়ি আসতেন। শেষের দিকে পৈতৃক বাড়িতে আসা একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। এমনকি বার্ধক্যহেতু তাঁর পক্ষে বিদেশে বাস যখন আর সম্ভব হল না, তখনও তিনি পরিবার হতে দূরে থাকতেন। প্রথমে এই ভাবে তিনি কিছুকাল চুঁচুড়ায় কাটান এবং পরে দীর্ঘকাল পার্ক স্ট্রীটের এক ভাড়া বাড়িতে থাকেন। কেবল জীবনের শেষের কয় বৎসর তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফিরে এসে বাস করেন।

সৌভাগ্যক্রমে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটির ভার নেবার উপযুক্ত মানুষ তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যেই পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবীর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ ক'রে মহর্ষি এক রকম নিশ্চিন্তই ছিলেন; কিন্তু আকস্মিকভাবে সারদাপ্রসাদ ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে মারা যান। সুতরাং উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নির্বাচনের সমস্যা দেখা দেয়।

এই কাজের জন্য মহর্ষি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকেই নির্বাচন করেন। তবে মনে হয় প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। কোন্ সময় হতে তিনি সম্পূর্ণভাবে জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন তা নিশ্চিতভাবে ঠিক করা শক্ত। ১৮৯০ খৃস্টাব্দের শেষে তিনি তাঁর সিভিলিয়ান বন্ধু লোকেন পালিত ও মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েক মাসের জন্য বিলাত যান। মনে হয় সম্ভবত তার পূর্বেই তিনি জমিদারির সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনার সুবিধার জন্য জমিদারির ভৌগোলিক অবস্থিতি সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই পৈতৃক জমিদারি চারটি তহশীলে বিভক্ত ছিল; বিরাহিমপুর, কালীগ্রাম, সাহাজাদপুর এবং পাণ্ডুয়া। এদের মধ্যে পাণ্ডুয়া তহশীলের জমিগুলি ছিল উড়িষ্যার কটক জেলায় অবস্থিত। তা ছিল আকারে সব থেকে ছোট। বাকি তিনটি তহশীল উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। এদের মধ্যে সাহাজাদপুর তহশীল পাবনা জেলার, কালীগ্রাম তহশীল রাজসাহী জেলার এবং বিরাহিমপুর তহশীল নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোট নীট আয় ছিল ২,৩৪,৩০০৲ এবং তার মধ্যে পাণ্ডুয়া তহশীলের আয় ছিল মাত্র ১৮,০০০৲।

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে জমিদারির মূল অংশ উত্তরবঙ্গেই ছিল। সেই কারণে কেন্দ্রীয় কাছারিটি অবস্থিত ছিল শিলাইদহে, পদ্মার দক্ষিণ তীরে। কুষ্টিয়া নগর হতে তার দূরত্ব ছিল কয়েক মাইল মাত্র। সাহাজাদপুর তহশীলের কাছারি ছিল সাহাজাদপুরে। আত্রাই নদীর সঙ্গে তা একটি ছোট খাল দ্বারা সংযুক্ত। আর কালীগ্রাম তহশীলের কাছারি অবস্থিত ছিল পতিসরে। তা নাগর নামে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর পাশে অবস্থিত। তা আত্রাই নদীর এক উপনদী। আবার আত্রাই যমুনার এক উপনদী।

সুতরাং জমিদারি কার্য তত্ত্বাবধানের জন্য রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে থাকতে হত এবং অন্য তহশীলের কাজ

পরিদর্শনের জন্য বড় হাউস-বোটে ক'রে জলপথে সাহাজাদপুর, পতিসর ও কালীগ্রামে যেতে হত। এই পথে পদ্মা ও যমুনাই ছিল প্রধান যোগসূত্র। পতিসরে যেতে পথে চলন বিল পার হতে হত।

প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ একাই জমিদারি তত্ত্বাবধানের জন্য উত্তরবঙ্গে যেতেন। তখন তাঁর পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়িতেই বাস করতেন। তিনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় ফিরে আসতেন। বাড়িতে তখন 'খামখেয়ালী' সভা নামে এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের উৎসাহে গড়ে উঠেছিল। কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁদের উৎসাহিত করতে সেই সভায় তাঁর যোগ দিতে হত।

এই ব্যবস্থা অনেক দিন ধরে চলেছিল। পরে ছেলে মেয়েরা যখন বড় হয়ে উঠলেন এবং তাঁদের পড়াশোনার ভার নিজে গ্রহণ করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। এই ব্যবস্থা ১৮৯৭ খৃস্টাব্দ হতে প্রবর্তিত হয়। তবে তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। কয়েক বছর পরে রথীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু বিদ্যালয় সম্বন্ধে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর পুত্রকে গতানুগতিক পথে মামুলী বিদ্যালয়ে পাঠাতে মন চাইল না। পরে তিনি বোলপুরে তপোবনের আদর্শে ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। সুতরাং ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হতে শিলাইদহের জীবনের উপর যবনিকা পাত হল।

এখন আমাদের পূর্বের প্রশ্নে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। প্রশ্ন হল তিনি ১৮৯০ খৃস্টাব্দে বিলাত যাবার পূর্বেই জমিদারি তত্ত্বাবধানের পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছিলেন কি না। তিনি যে তাই করেছিলেন তার সপক্ষে একাধিক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সময় পারিবারিক 'খামখেয়ালী' সভার সভ্যগণ কর্তৃক অভিনয়ের জন্য একটি নাটকের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এই নাটক

রচনার ভার নেন। এই সূত্রেই 'রাজর্ষি' কাহিনীর 'বিসর্জন' নামে নাট্যে রূপান্তর ঘটে। এই নাটকটি নাকি তিনি সাহাজাদপুরের কাছারিবাড়িতে বসে ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে লেখেন।

আমরা দেখি তিনি ১৮৯০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সাহাজাদপুরের বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন এবং তার পরিদর্শন-পুস্তকে ইংরেজিতে একটি মন্তব্যও লিপিবদ্ধ ক'রে এসেছেন। এর আলোক-চিত্র রবীন্দ্রভারতীর প্রদর্শশালায় রক্ষিত আছে।

সব থেকে ভালো প্রমাণ পাওয়া যায় 'ছিন্নপত্রাবলী' হতে। এই সময় তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠিগুলি লিখতেন তারই সংগ্রহ হল 'ছিন্নপত্রাবলী'। তার ৩ সংখ্যক চিঠি শিলাইদহ হতে ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে লেখা। তার ৫ সংখ্যক চিঠি সাহাজাদপুর কাছারিবাড়ি হতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লেখা। তার ৬ সংখ্যক চিঠিও এই সময় লেখা। এই শেষের চিঠিতে যে বিবরণ পাই তা পড়ে মনে হয় তিনি তখন জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন। সেখানে তিনি নিজেকে জমিদারবাবু বলে বর্ণনা করেছেন। জেলার কালেক্টারকে দুর্যোগের দিনে অতিথি হিসাবে আশ্রয় দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এই সকল তথ্যকে ভিত্তি ক'রে এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে সম্ভবত ১৮৮৯ খৃস্টাব্দ হতে তিনি উত্তরবঙ্গকে স্থায়ীভাবে নিজের কর্মস্থান হিসাবে নির্বাচন ক'রে নিয়েছেন।

সুতরাং এইভাবে প্রথমজীবনে দীর্ঘ বারো বৎসর কাল তাঁর অতিবাহিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গে প্রধানত পদ্মার মনোরম পরিবেশে। দেখা যায় এক আকস্মিক ঘটনাই রবীন্দ্রনাথের আবাস ক্ষেত্রের বিপর্যয়কর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। যিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ ক'রে কলিকাতার বদ্ধ পরিবেশে মানুষ, তিনি এক নূতন জায়গায় স্থাপিত হলেন। সেখানে প্রকৃতির হস্তে রচিত শান্তিকুঞ্জ তাঁর মূল আবাস-কেন্দ্র। জলপথে বিরাট নদীর বক্ষে কর্ম উপলক্ষ্যে ভ্রমণের সময়

প্রকৃতির সহিত নিত্য নূতন পরিবেশে নূতন পরিচয়। যিনি কলিকাতায় বাসকালে প্রকৃতির এতটুকু স্পর্শ পাবার জন্য আকুল হতেন, তিনি প্রকৃতির একচ্ছত্র রাজ্যের মাঝখানটিতে আশ্রয় পেলেন।

অপরপক্ষে যিনি মহানগরীর বিত্তবান সমাজের মধ্যে বাস করতে অভ্যস্ত তিনি নগরজীবনের স্পর্শ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত অকৃত্রিম জীবনে অভ্যস্ত গ্রামের মানুষের নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ পেলেন। গ্রামের পোস্টমাস্টার, মফস্বলের সরকারী কর্মচারী, জমিদারির নায়েব গোমস্তা আমিন চাষী প্রজা—এরাই তাঁর জীবনের নিত্যসঙ্গী হল। অতিরিক্ত-ভাবে কর্ম উপলক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় তীরে অবস্থিত পল্লীগুলির মানুষের সঙ্গে নানা সূত্রে পরিচয় লাভ ক'রে পল্লীজীবন সম্বন্ধে তিনি নিবিড় অভিজ্ঞতার সুযোগ লাভ করলেন।

এইভাবে প্রকৃতির স্পর্শবর্জিত নগরজীবন ও শহরবাসী মানুষের পরিবর্তে প্রকৃতি ও পল্লীসমাজের মাঝখানে তিনি স্থাপিত হলেন। এক দিকে পল্লীর মানুষের সহজ সরল জীবনপ্রবাহ, অপর দিকে অবারিত প্রকৃতির নিবিড় স্পর্শ। এই যুগলধারার প্রভাবে তাঁর জীবন-প্রবাহিণী নূতন পথে প্রবাহিত হল। এই নূতন জীবনের আকর্ষণ তাঁর কাছে কত তীব্র ছিল, তা তাঁর নীচের উক্তি হতে বোঝা যাবে :

"আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এ পারে কিছু বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি।"[১]

প্রকৃতির ক্রীড়াভূমিস্বরূপ এই বিস্তারিত অঞ্চলে তাঁর বাস পূর্বের জীবনপ্রণালী হতে এমন আকাশ-পাতাল পৃথক যে তাঁর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত না ক'রে পারে নি। সে প্রভাব তাঁর জীবনকে

(১) সোনার তরী, সূচনা

মূলত দুইভাবে রূপান্তরিত করেছিল। তাঁর সাহিত্যিক রচনা প্রথমত তার প্রভাবে নূতন পথে প্রবাহিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত পল্লীর মানুষের সহিত নিবিড় পরিচয়ের ফলে পল্লী-উন্নয়নের কাজে তাঁকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিল। তবে যিনি মূলত কবি, তাঁর কাব্যপ্রবাহিণী একেবারে থেমে যেতে পারে না এবং থেমে যায়ও নি। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে তা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত এ সম্পর্কে এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে তাঁর কাব্যেও নূতন পরিবেশের প্রভাব দেখা যায়। আমাদের এই তিনটি প্রতিপাদ্যকে এর পর আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনার প্রস্তাব করি।

তাঁর সাহিত্যিক রচনার নূতন রূপ আমরা পাই তাঁর লেখনী-নিঃসৃত এই যুগের গল্পধারার মধ্যে। একটু আগে যে বলা হল তাঁর কাব্য প্রবাহ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল তারও এই প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে কাব্যলক্ষ্মী বাল্য হতেই তাঁর বাগদত্তা এবং আজন্ম সাধনধন, তাঁর আবির্ভাব এ যুগে অনবছিন্ন ধারায় ঘটে নি। এই দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে তিনি যে উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থগুলি রচনা করেন, তারা সংখ্যায় মাত্র ছয়টি—'সোনারতরী' 'চিত্রা' 'চৈতালি' 'কল্পনা' 'ক্ষণিকা' ও 'নৈবেদ্য'। এদের মধ্যে 'চৈতালি' আবার একান্তই এই নদীমাতৃক দেশের দৃশ্যাবলী দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। অপর পক্ষে আমরা দেখি এই যুগে তাঁর গল্পগুচ্ছের নব্বইখানি গল্পের মধ্যে পঞ্চাশখানি রচিত হয়েছিল এই সময়ের মধ্যে।

অবশ্য রচনার এই রূপপরিবর্তনের জন্য বাহিরের তাগিদ যে একেবারেই ছিল না তা নয়। মাঝে মাঝে সাহিত্যিক পত্রিকা চালাবার দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ায় গল্পের চাহিদা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। ১৮৯১ খৃস্টাব্দের মে মাসে হিতবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রবর্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্য-সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সম্পর্কে নিজের দায়িত্ব সম্পাদনের তাগিদে তিনি পাঁচটি

গল্পরচনা ক'রে তাতে প্রকাশ করেন। তাদের মধ্যে 'পোস্টমাস্টার' অন্যতম।

১৮৯১ খৃস্টাব্দের নভেম্বর হতে ঠাকুরবাড়িতে 'সাধনা' নামে একটি নূতন পারিবারিক পত্রিকা প্রবর্তিত হয়। প্রথমে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ; পরে সম্পাদনার ভার তাঁর নিজের উপর বর্তায়। উভয়ক্ষেত্রেই গল্পের জন্য পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথের উপর প্রধানত নির্ভরশীল ছিল। এই পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি মোট সাঁইত্রিশটি গল্প লেখেন। তাদের মধ্যে 'ক্ষুধিত-পাষাণ' 'কাবুলিওয়ালা' ও 'অতিথি' অন্যতম। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দ হতে পুরাতন পারিবারিক পত্রিকা 'ভারতী'র সম্পাদনার ভার তাঁর উপর বর্তায়। সুতরাং তার তাগিদেও তিনি গল্প লিখতে বাধ্য হন। এই পত্রিকার জন্য তিনি আটটি গল্প লেখেন। তাদের মধ্যে ছিল 'মণিহারা' ও 'দৃষ্টিদান'।

কিন্তু এই রূপপরিবর্তনের মূল কারণ ছিল বিভিন্ন। তা হল এই নূতন পরিবেশের প্রভাব এবং তা হতে সঞ্চারিত প্রেরণা। পল্লীর বুকে বসে জমিদারি কার্য সম্পাদন করতে করতে গ্রামের সমাজ-জীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল। বিভিন্ন কাছারিতে নৌকাযোগে যাতায়াত করতে গ্রাম্যজীবনের কত দৃশ্য তাঁর দৃষ্টি পথে এসে তার মনের মধ্যে রেখাপাত করেছিল। এই নূতন অভিজ্ঞতা তার শিল্পী মনকে শুধু নূতন ফসলের জন্য কর্ষণ করে নি, নূতন শ্রেণীর ফসলের বীজও তাঁর মনে বপন করেছিল। সে বিষয় তিনি নিজে কতখানি অবহিত ছিলেন তা ভালো হৃদয়ঙ্গম হয় তাঁর নীচে উদ্ধৃত উক্তি হতে:

"বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে, ইছামতী থেকে বড়লে, হুড়ো সাগরে, চলন বিলে, আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে, যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে। দুই ধারে কত টিনের-ছাদওয়ালা গঞ্জ, কত মহাজনী নৌকার ভিড়ের কিনারায় হাট, কত ভাঙনধরা তট, কত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম।

ছেলেদের দলপতি ব্রাহ্মণ-বালক, গোচারণের মাঠে রাখাল ছেলের জটলা, বনঝাউ-আচ্ছন্ন পদ্মাতীরের উঁচু পাড়ের কোটরে কোটরে গাঙ-শালিকের উপনিবেশ। আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম-গ্রামান্তরের পথে-ফেরা এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূমিকায়।"[২]

এই নূতন পরিবেশের নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে তাঁর গল্পধারার একটি নাড়ির সংযোগ ছিল তা খুবই সত্য। কারণ, দেখা যায় যে এই পরিবেশ ত্যাগ ক'রে শিক্ষাব্রতী হিসাবে নূতন ক্ষেত্রে সাধনার জন্য তিনি যখন শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করলেন, তখন হতেই এই গল্পের ধারা একেবারে থেমে না যাক স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়েও যে তিনি নিজে অবহিত ছিলেন তা বেশ বোঝা যায় তাঁর এই উক্তি হতে :

"সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোট গল্পের নিরন্তন ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্রসাধনের ক্ষেত্রে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি অনুসারে পদ্মা-যমুনার সঙ্গম ক্ষেত্রের এই নদীমাতৃক ভূমির সহিত সম্পর্কচ্ছেদের সঙ্গে তাঁর গল্পধারার একটি প্রাণের যোগ ছিল। তাঁর উক্তি হতে এই সমর্থন অনেককে হয়ত আশ্চর্য ক'রে দেবে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য। কারণ, এখানকার জীবন যেমন তাঁর পল্লীসমাজের সঙ্গে পরিচয়ের অবাধ সুযোগ এনে দিত, তেমন এখানকার নিঃসঙ্গ জীবনে গল্পরচনার কাজ তাঁকে সঙ্গ দান ক'রে তৃপ্ত করত। প্রথমে যখন একা থাকতেন তখন তো তাঁর অষ্টপ্রহরই একা কাটত। পরে যখন সপরিবারে বাস করতেন তখনও নদীপথে ভ্রমণের সময় তাঁর নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবন কাটত। গল্প রচনা করতে গিয়ে তিনি যে চরিত্রগুলির অবতারণা

২ প্রবাসী, ১৩৪৪ বৈশাখ

৩ সোনার তরী, সূচনা

করতেন তারাই তাঁর সঙ্গী হয়ে তাঁর একক জীবনকে সহনীয় ক'রে তুলত। প্রবন্ধ রচনায় সেটা সম্ভব নয়, এমন-কি কাব্যরচনায়ও তা সম্ভব নয়।

এই কারণটি তিনি নিজেই এই সময় ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্‌ধৃত হল:

"সাধনায় উচ্চ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতির পথে লগি ঠেলে নিয়ে যাওয়া খুব মহৎ কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্প্রতি তাতে আমি তেমন সুখ পাচ্ছিনে, এবং পেরেও উঠছিনে। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোট অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে।"[৪]

বলা বাহুল্য, গিরিবালা হলেন তাঁর 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের নায়িকা।

এই সময় লিখিত গল্পগুলির কাহিনী যে শুধু পল্লীজীবনকে অবলম্বন ক'রে প্রধানত রচিত হয়েছে তাই নয়, তার পরিবেশ এই রমণীয় নদীমাতৃক দেশ হতে সংগৃহীত হয়েছে। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে প্রসঙ্গত দু-একটি উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে।

প্রথম পোস্ট্‌মাস্টারের কাহিনীই ধরা যাক। এর যিনি নায়ক তাঁর মডেল রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি-মতে সাহাজাদপুরের পোস্ট-আপিসের পোস্টমাস্টার ছিলেন। তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী'র দুখানি চিঠিতে এঁর সম্পর্কে উল্লেখ আছে। একটির তারিখ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ এবং অপরটির তারিখ ২৯শে জুন ১৮৯২। দুখানি চিঠিই সাহাজাদপুর হতে লেখা। দ্বিতীয় চিঠি হতে প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্‌ধৃত হল:

৪ ছিন্নপত্রাবলী, ১২৩ সংখ্যক চিঠি, তারিখ ২৭।৬।১৮৯৪

"এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট্ অফিস ছিল এবং আমি একে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনি আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্ট্মাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম, এবং সেই গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোস্ট্মাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন।"

প্রসঙ্গত এই চিঠিতেই স্থানীয় এক মুন্সেফবাবুর কথার উল্লেখ আছে। এমনও হতে পারে তাঁকে অবলম্বন করে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটির মুন্সেফের চরিত্র অঙ্কিত হয়েছিল।

কাহিনীগুলির পরিবেশ যে এই অঞ্চল হতেই সংগৃহীত হয়েছিল তারও সুন্দর উদাহরণ এই দুটি গল্প হতেই সংগ্রহ করা যায়।

'পোস্টমাস্টার' গল্পে বর্ষার যে মনোরম বর্ণনা আছে তা এই অঞ্চলেরই বর্ষাকালের দৃশ্য। এটা খাল-বিলের দেশ। পাকা রাস্তা বড় একটা নেই। জলপথে নৌকাযোগে যাতায়াতই সাধারণ রীতি। সুতরাং বর্ষার প্লাবনে গ্রামের অভ্যন্তরেও নৌকাযোগেই যাতায়াত করতে হয়। এই প্রসঙ্গে এই গল্প হতে দৃষ্টান্তস্বরূপ নীচে উদ্ধৃত অংশটি দেখা যেতে পারে।

"শ্রাবণ মাসে বর্ষার অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ। নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।"

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এর কাহিনীটির পটভূমি যে পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চল তাও এই গল্পের মধ্যেই উল্লেখ আছে। রাইচরণ যখন খোকাবাবুকে খুশি করতে তাকে গাড়ি হতে নামতে বারণ ক'রে কদম ফুল পাড়তে চলল, তখন খোকাবাবু কাদের প্ররোচনায় আকৃষ্ট হল, তার একটি সুন্দর চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছে। বর্ষার ভরা পদ্মার অসংখ্য স্রোতের সঙ্গে সেখানে চঞ্চলমতি শিশুদের তুলনা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক অংশটি এই :

"দেখিল জল খল খল ছল ছল করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।"

জমিদারি তত্ত্বাবধানকে উপলক্ষ্য ক'রে তাঁর পল্লীজীবনের সহিত যে নিবিড় পরিচয় হয় তাও তাঁর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। এই হল আমাদের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য। এর সমর্থনে প্রমাণ আমরা তাঁর নিজের উক্তি, আচরণ এমনকি কবিতার বাণীর মধ্যেও খুঁজে পাই। যিনি ছিলেন খাস কলিকাতা মহানগরীর সন্তান, যাঁর বাল্যে গ্রাম্য পরিবেশের ক্বচিৎ পরিচয় ঘটেছে, তিনি কর্ম উপলক্ষ্যে স্থাপিত হলেন একেবারে পল্লীর মাঝখানটিতে। সেখানে গ্রামের মানুষের সঙ্গে তাঁর নিত্য সংযোগ। যারা তাঁর প্রজা তারা খাজনা দিতে আসে বা তাঁর কাছে জমি বন্দোবস্ত নিতে আসে বা জমি হস্তান্তর হলে নাম খারিজ করতে আসে। তারা গ্রামেই বাস করে। তারা প্রধানতই চাষী শ্রেণীর লোক; কিছু কারিগর শ্রেণীর লোকও আছে; আবার কিছু মধ্যবিত্ত গৃহস্থও আছে। জমিদারি পরিদর্শনের সময় নানা কর্ম সম্পর্কে তাদের গ্রামে তাঁর যেতে হয়, তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতে হয়, তারা কি দুরবস্থার মধ্যে বাস করে তা চোখে দেখতে হয়। এই ভাবে এইখানেই যে পল্লীর মানুষের সহিত প্রথম নিবিড় পরিচয় হয়েছিল, তার উল্লেখ তিনি নানা ভাষণে ও নানা রচনায় করেছেন। তার একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

"কর্ম উপলক্ষ্যে বাংলার পল্লীগ্রামের নিকট পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত আরোগ্যে দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন দিয়ে তারা

পদে পদে কি রকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে, তার প্রমাণ বারবার পেয়েছি।"[৫]

তাদের এই চূড়ান্ত দুর্দশা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে রীতিমত বিচলিত করেছিল। এমনকি তার জন্য তিনি কবিজীবনের প্রতিও এত গভীর ভাবে ধিক্কার বোধ করেছিলেন যে সমাজসেবামূলক কাজ নেবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। এই ধিক্কারবোধই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে'র প্রেরণা জুগিয়েছিল বলে মনে হয়। তার প্রথম স্তবক হতেই তা পরিস্ফুট হবে :

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি।

যাদের দৈন্যদশা তাঁকে এমনভাবে কশাঘাত করেছিল তারা 'নতশির মূক সবে' 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া।' তাই এই পল্লীবাসী অবহেলিত পদদলিত মানুষগুলির প্রতি তাঁর মনে একটি বিশেষ কর্তব্যবোধ জেগেছিল। তাই নিজেকে সম্বোধন ক'রে এই কর্তব্যের কথা শুনিয়েছিলেন,

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ;

শুধু কাব্যজীবন নয়, এই কর্তব্যবোধের নিপীড়নে তাঁর সাধন-জীবনও বিঘ্নিত হয়েছিল। নির্জনে ধ্যান বা একাকী বসে উপাসনা, তাঁর কাছে এর পর অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মনে একটা ধারণা জেগেছিল ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনা ত্যাগ ক'রে দরিদ্র ও নিপীড়িতের সেবার মধ্যেই তাঁর মুক্তি। এই বিশ্বজনীন কল্যাণকর্মে

৫ শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডারের উদ্বোধন অভিভাষণ

আত্মনিয়োগের প্রেরণা হতেই তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের রূপ কেমন হবে, তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। সর্বজনীন কর্মে আত্মনিয়োগের আকর্ষণ তিনি অনুভব করেছিলেন। তারই ফলে তাঁর শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রম এবং শ্রীনিকেতনের পল্লী-উন্নয়নের যুগ্মপরিকল্পনা জন্মগ্রহণ করে। তাঁর 'রিলিজিয়ান অফ ম্যান' গ্রন্থে এ বিষয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি আছে। সে উক্তিটির বাংলা অনুবাদ এই দাঁড়ায়:

'নির্জনে অসীমের ধ্যান আর আমাকে আনন্দ দিত না এবং আমার নীরব উপাসনার জন্য যে বাণী আমি ব্যবহার করতাম, তা আমার অজ্ঞাতসারে আমাকে আর প্রেরণা দিত না। আমি এ বিষয় নিশ্চিত যে আমি অস্পষ্টভাবে বোধ করতাম যে, আমার যা প্রয়োজন তা হল পরার্থপ্রণোদিত কর্ম দিয়ে মানুষের সেবা ক'রে আত্মিক সিদ্ধিলাভ'[৬]

এই কারণে জীবনের এই অধ্যায়ের মধ্যেই তিনি জমিদারির অন্তর্ভুক্ত পল্লীগুলিতে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু শুধু তাই ক'রে তাঁর তৃপ্তি হয় নি। এ বিষয়ে তিনি আরও গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে পল্লীর উন্নয়ন কৃষির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেই কারণে উন্নত প্রথায় কৃষির ব্যবস্থা না হলে পল্লী অঞ্চলে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে পরীক্ষামূলক কাজ চালাবার উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশ হতে উন্নত কৃষিবিদ্যা সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই তিনি তাঁর কনিষ্ঠা জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে কৃষি শিক্ষার জন্য আমেরিকা পাঠান। পরে এক সঙ্গে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষ মজুমদারকে কৃষিশিক্ষার জন্য ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান।

পরে রথীন্দ্রনাথ যখন শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে দেশে ফিরে আসেন,

৬ Religion of Man, Chap XII, The Teacher

তিনি তাঁকে শিলাইদহকে কেন্দ্র ক'রে কৃষি-উন্নয়নের কাজে এবং জমিদারির মধ্যে পল্লী-উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত করেন। এর জন্য শিলাইদহের খাস জমিতে একটি বড় খামার স্থাপিত হয়। এ বিষয় যা কাজ হয়েছিল তার কথা রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন। তার পর শান্তিনিকেতনের কাজ যখন এত বৃদ্ধি পেল যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একা তার দায়িত্ব বহন করা সম্ভব হল না, তখনই তিনি রথীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আনিয়ে নিলেন। এই ভাবে জমিদারি অঞ্চলে পল্লী-উন্নয়নের কাজের সমাপ্তি ঘটে।

এখানকার পরীক্ষামূলক কাজ কিন্তু বৃথা যায় নি। সেখানে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূতন ক'রে শ্রীনিকেতনে পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং নূতন উদ্যমে কাজ শুরু হয়। এবার তত্ত্বাবধানের জন্য এলেন লেনার্ড এলমহার্স্ট। এই নূতন পরিকল্পনায় কোনো নির্দিষ্ট নীতি প্রয়োগ না হলেও কতকগুলি মৌলিক নীতি রবীন্দ্রনাথ বেঁধে দিয়েছিলেন। যেমন গ্রামবাসীকে বাহির হতে সাহায্য করা হবে না, তার শক্তির উৎস নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করতে হবে, সমবায় শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে ইত্যাদি। এই নীতিগুলি উত্তরবঙ্গে লব্ধ অভিজ্ঞতার উপরই গড়ে উঠেছিল। সুতরাং শ্রীনিকেতনের সঙ্গে উত্তরবঙ্গে সমাজসেবামূলক কাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল।

উত্তরবঙ্গের নূতন পরিবেশ এবং নূতন মানুষের সহিত পরিচয় এই ভাবে তাঁর সাহিত্যরীতি ও কর্মজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। ফলে, জীবনের এই অধ্যায়ে এক দিকে সাহিত্য রচনার প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল গল্পধারা। অপরদিকে গ্রামবাসীদের দুঃখদুর্দশার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর মধ্যে সমাজসেবায় আত্ম-নিয়োগের একটি প্রবল আকূতি জাগিয়েছিল। পরবর্তীকালে পরিণতিতে তাই শ্রীনিকেতনের পল্লী-উন্নয়নের কাজে তাঁকে ব্রতী করেছিল। আনুষঙ্গিক ভাবে এ কথাও স্বীকার্য যে এই সময় তাঁর কাব্যরচনার মধ্যেও এই নূতন পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এইভাবে মানুষ ও প্রকৃতির সহিত নিবিড় সংযোগ তাঁর কাব্য-শক্তিকে দিয়েছিল নূতন পথে বিচিত্র প্রেরণা। সে সময়ে রচিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের মধ্যে তার প্রমাণ নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। মূলত কাব্য রচনায় বৈচিত্র্য এসেছিল দুই ভাবে। প্রথমত, নূতন ধরনের ভাব তাঁর কাব্যে এর ফলে আত্মপ্রকাশ করেছিল, দ্বিতীয়ত, কাব্যের মধ্যে নানা দৃশ্যের বর্ণনায় এই নদীমাতৃক দেশের ছবিখানি সুস্পষ্টভাবে রূপ নিয়েছিল। প্রথমটির উদাহরণ হিসাবে আমরা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির বিষয় আবার উল্লেখ করতে পারি। সাহিত্যের আসর ছেড়ে সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা সেখানে প্রবলরূপে দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, জীবনদেবতা'-তত্ত্বের প্রথম আবির্ভাব তাঁর এই যুগে রচিত 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে প্রথম ঘটেছিল, সে কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

উত্তরবঙ্গের দৃশ্যাবলী নানাসূত্রে যে তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ে রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে তা প্রমাণ করতে খুব কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের কথাই ধরা যাক না কেন। তার কবিতার মধ্যে মাঝে-মাঝে পদ্মা ও তার উপনদীগুলির মুখখানি যেন উঁকি মারছে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে 'সন্ধ্যা' নামে একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে;

হেরো ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই-তিন
কুটির-অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য হল সমাপন—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির মধ্যে 'উর্বশী' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ঠিক বলতে নারীর উন্মাদনা রূপের এমন সুন্দর প্রশস্তি সম্ভবত আর রচিত হয় নি। কতকগুলি কারণে মনে হয় যে সম্ভবত পদ্মার তরঙ্গমালা এবং তীরভূমিতে ধানক্ষেতের অনন্তবিস্তারের মধ্যে, বাতাসের সঞ্চরণ তাঁর মনে যে অনুভূতি জাগিয়েছিল, তা হতেই মনোরম কবিতাখানির পরিকল্পনাটি তাঁর মনে ফুটে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে।

'উর্বশী' রচিত হয় ১৩০২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে। তখন কবি জলপথে নৌকাযোগে শিলাইদহ অভিমুখে যাচ্ছিলেন। পদ্মার দুই তীরে ধানক্ষেতগুলিতে তখন ধানগাছ বেশ বড় হয়ে উঠে থাকবে, সম্ভবত কোথাও কোথাও ধানের শিষও দেখা দিয়ে থাকবে। তখন হেমন্ত কাল। কাজেই সম্ভবত উত্তরে বাতাস ধীরে বইতে শুরু ক'রে থাকবে। তার স্পর্শে ধানের মাথাগুলি মৃদুভাবে আন্দোলিত হওয়া সম্ভব। সেই মৃদু আন্দোলন শিহরণের সহিত তুলনীয়। ধরণীর আঁচলখানি যেন শিহরিত হয়ে উঠছে এ কল্পনা জাগা স্বাভাবিক। কবির মনের রহস্য কে ভেদ করবে? মনের অন্দরমহলে কি ভাবে কোন্ কবিতার আবির্ভাব হয় বলা শক্ত। তবে এমন প্রশ্ন তোলা অসঙ্গত হবে না যে সেই দোলায়িত অঞ্চলের শোভাই কি নৃত্যরত উর্বশীর তনুদেহের লালায়িত সুষমার কল্পনা তাঁর মনে জাগিয়েছিল? তারই আবেশে কি তিনি লিখেছিলেন,

> সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
>
> হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী,
>
> ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল
>
> শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল।

জীবনের এই অধ্যায়ে রচিত কাব্যগুলির মধ্যে 'চৈতালি' অন্যতম। তা আকারে ক্ষুদ্র হলেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত; তার একটি স্বতন্ত্র সুর আছে। এখানে যা আছে তার মধ্যে অনুভূতির উচ্ছ্বাস

পাই না, ঘটনা পাই না, তাতে পাই ছবি। এই নদীমাতৃক দেশে নৌকাযোগে ঘুরতে তাঁর চোখের সামনে যে ছবিগুলি ফুটে উঠেছিল তা সহজ সরল ভাষায় তিনি কবিতাগুলির মধ্যে ধরে রেখেছেন। এ যেন কবিতায় লেখা ছবির বই। ঠিক বলতে কি, পতিসরের কাছে নৌকা নোঙর ক'রে বসে তিনি এই কবিতাগুলির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন। সে কথা এই গ্রন্থের সুচনায় তিনি বলেছেন এই ভাবে :

"পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়াল ঘর, ধানের মরাই, বিচালীর স্তূপ, অন্যতীরে বিস্তীর্ণ ফসল-কাটা শস্যক্ষেত শুধু ধূ ধূ করছে। কোনো এক গ্রীষ্মকালে এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মত অবস্থা নয়। বোটের বাইরের জানালা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই স্পষ্ট করে দেখছি। সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রেখেছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়।"

এই নিরলংকৃত ভাষায় আঁকা একখানি ছবি এখানে উদ্‌ধৃত ক'রে আমাদের বর্তমান আলোচনা শেষ করতে পারি। নাগর নদীর ঘাটে দ্বিপ্রহরের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এই ভাবে :

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী-'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবে। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্যঘাট-তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি।

মনে হয়, তুলি দিয়ে এর থেকে ভালো ছবি আঁকা যেত না।

ইংরাজি গীতাঞ্জলির কাহিনী

রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি গীতাঞ্জলির রচনা ও প্রকাশন কাহিনী একদিকে যেমন রোমাঞ্চকর অন্য দিকে তেমন গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ঠিক বলতে কি, তা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তাঁকে একটি নূতন ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য করেছিল। যিনি ছিলেন বাঙালীর কবি, তিনি পরিণত হয়েছিলেন বিশ্বের কবিতে। যিনি ছিলেন ঘরের মানুষ, তিনি হলেন বিশ্বের মানুষ। তাই হল বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রকাশিত হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্র তার মধ্যে ভাবী সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তার পর যে কাব্যশক্তি মুকুল আকারে এই গ্রন্থে দেখা দিয়েছিল তা পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যে পরিণতরূপে প্রকট হয়ে কাব্যে ও কথাসাহিত্যে তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে 'রাজর্ষি' প্রকাশ হয়েছে, 'চিত্রা' ও 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য রচিত হয়ে গেছে, 'চোখের বালি'ও প্রকাশ উন্মুখ। অজস্রধারে ছোট গল্প প্রকাশ হয়ে গেছে। তবু তখনও তিনি বাঙালীর কবিই রয়ে গিয়েছেন। ভারতের পূর্বাংশের এক স্থানীয় ভাষায় তাঁর সাহিত্য তখন পর্যন্ত রচিত হয়ে তার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্বের মানুষের কাছে তাঁর মনীষা তখনও অপরিচিত রয়ে গিয়েছিল।

এই পরিবেশে মাঝখানে কতকগুলি অসংলগ্ন ঘটনার সমাবেশে হঠাৎ এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যা তাঁকে আকস্মিকভাবে বিশ্বের মানুষের সহিত পরিচিত করিয়ে দিল। সেই ঘটনাগুলি এই।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু তাঁর জীবনে এক বিষাদের অধ্যায় প্রবর্তিত করে। প্রথমত তাঁর সংসার গৃহিণীর কল্যাণ হস্তের স্পর্শ হতে বঞ্চিত হল। দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পীড়িত হয়ে পড়লেন। কন্যার পরিচর্যায় তাঁর দিন কাটতে লাগল; কিন্তু তাঁর চেষ্টা সার্থক হল না, মৃত্যুর হাত হতে তাঁকে রক্ষা করতে

পারলেন না। তিন বৎসরের মধ্যে তিনি পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে হারালেন। আরও দুঃখ ভাগ্যে লেখা ছিল; কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথকেও অকালে হারালেন। এইভাবে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা তাঁর জীবনের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হল। পারিবারিক জীবনের সেবা-যত্ন হতে তিনি এক রকম বঞ্চিত হলেন। ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় ডাক্তার তাঁকে উপদেশ দিলেন বিলাত গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

ঠিক তার আগে প্রথম পুত্র রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা হতে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে এসেছেন। প্রতিমা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পাদিত হয়ে কবির নূতন করে সংসার গড়ে উঠেছে। সুতরাং ঠিক হল কলিকাতা হতে জাহাজে করে তিনি সপরিবারে চিকিৎসার জন্য লণ্ডনে যাবেন। জাহাজ চাঁদপাল ঘাট হতে ছাড়বে। আগের দিন রাত্রে মালপত্র জাহাজে পাঠানো হয়ে গেল।

এদিকে পরিবারেব বিশিষ্ট জামাতা আশুতোষ চৌধুরী তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ীতে কবির জন্য একটি বিদায় ভোজের আয়োজন করেছিলেন। রাত্রে ফিবে আসবার পর কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে বাধ্য হয়ে পরের দিন জাহাজে রওনা হবাব সংকল্প তাঁর ত্যাগ করতে হল। মালপত্র জাহাজ হতে ফিরিয়ে আনা হল।

তিনি রোগমুক্ত হবার পর আবার নূতন করে বিলাত যাবার ব্যবস্থা চলতে লাগল। কিন্তু ইতিমধ্যে যে কয়েক সপ্তাহ সময় কাটাতে হবে তার ব্যবস্থা কি হবে? ডাক্তার তাঁকে কোন রকম পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছেন, এমন কি মৌলিক রচনা করাও নিষিদ্ধ। একই কারণে শান্তিনিকেতনে যাওয়া নিষিদ্ধ। এদিকে এত দীর্ঘকাল কলিকাতায় বসে কাটাতে তাঁর মন চায় না। অবশেষে ঠিক হল তাঁর যৌবনের সাধনক্ষেত্র শিলাইদহে গিয়ে তিনি এই সময়টা অতিবাহিত করবেন। সেখানে তিনি পাবেন মনের মত পরিবেশ; অপরপক্ষে কলিকাতা হতে তা এত দূরে যে তিনি অগণিত ভক্তদের নাগালের বাহিরে থাকবেন।

শিলাইদহে গিয়ে আর এক সমস্যার উদ্ভব হল। এখন সময় কাটে কি করে? সকল রকম পরিশ্রম নিষিদ্ধ, এমন কি মৌলিক রচনাও নিষিদ্ধ। সুতরাং এ সমস্যার সমাধান কি? ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হল তাঁর বাংলায় রচিত কবিতার অনুবাদ করলে ত সময় কাটে অথচ ডাক্তারের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করতে হয় না। ইতিমধ্যে 'মডার্ন রিভিয়ু'তে তাঁর কয়েকটি কবিতার নিজস্ব অনুবাদ ইংরাজিতে প্রকাশ হয়ে জগদীশচন্দ্র বসু ও আনন্দকুমার স্বামীর সপ্রশংশ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সুতরাং এ প্রচেষ্টা অর্থহীন নাও হতে পারে।

এইভাবেই কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশের ফলে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বসে তাঁর কবিতার অনুবাদের কাজে হাত দিলেন। তার ফল কত সুদূরপ্রসারী হবে তা হয়ত তখন তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল। কবিতাগুলি নির্বাচিত হল বিভিন্ন সময়ে রচিত নানা কাব্যগ্রন্থ হতে। সর্বমোট ১০৩ খানি কবিতার অনুবাদ দিয়ে তাঁর ইংরাজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি রচিত হল। অনুবাদে বাংলা নামই তিনি বজায় রাখলেন, সঙ্গে যুক্ত হল তার ইংরাজি অনুবাদ 'সং অফারিং' বিকল্প নাম হিসাবে।

অথচ বাংলা 'গীতাঞ্জলির' তা হুবহু অনুবাদ নয়, তাতে অন্য কাব্য-গ্রন্থের কবিতার অনুবাদও স্থান পেয়েছে। মনে হয় এই নামকরণে তিনি কিছু যুক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। প্রথমত অনুবাদে যে সব কবিতা স্থান পেয়েছিল তাদের অধিকাংশই, অর্থাৎ ৫৫টি নির্বাচিত হয়েছিল বাংলা 'গীতাঞ্জলি' হতে এবং বাকিগুলি নির্বাচিত হয়েছিল অন্য আটখানি কাব্যগ্রন্থ হতে। দ্বিতীয় কথা, তাদের মধ্যে এক 'গীতিমাল্য' হতেই ১৬টি কবিতা নির্বাচিত হয়েছিল। এই দুই গ্রন্থে একই ভাবধারা প্রবাহিত, কবির সঙ্গে তাঁর 'জীবন-দেবতার' বিরহ-মিলন কথাই তাদের বর্ণনীয় বিষয়। সুতরাং এই নূতন অনুবাদ গ্রন্থখানিরও মূল সুর বাংলা 'গীতাঞ্জলির' অনুরূপ; ঈশ্বরের সহিত ভক্তের প্রীতির বন্ধনে মধুর মিলনই তাদের প্রেরণা; এই হিসাবে গ্রন্থ দুখানি সমধর্মিতা গুণে চিহ্নিত।

এদিকে যথাসময় বিলাত যাবার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হল। কবি পি এণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে সপরিবারে বোম্বাই হতে ২৭শে মে ১৯১২ তারিখে লণ্ডন অভিমুখে রওনা হলেন। সেখানে পৌঁছাবার পর তাঁরা টমাসকুক কোম্পানির ব্যবস্থা মত ব্লুমসবারির এক হোটেলে থাকবার জন্য রওনা হলেন। চেয়ারিং ক্রশ রেলস্টেশান হতে এই হোটেল পর্যন্ত পথ তাঁরা 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড'-এ গিয়েছিলেন।

ব্যবস্থা ছিল পরের দিন সকালে পরিবারের বন্ধু খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী উইলিয়ম রদেনস্টাইন-এর সঙ্গে দেখা করে অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে আসবেন। ইতিপূর্বে পাণ্ডুলিপি সাবধানে রাখবার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল পুত্র রথীন্দ্রনাথের উপর। কিন্তু মহা মুস্কিল, পাণ্ডুলিপি ত খুঁজে পাওয়া যায় না। দেখা গেল, যে ব্যাগে পাণ্ডুলিপি ছিল সেটাই হারিয়ে গেছে। অনেক অনুসন্ধানের পর সেই হারানিধিকে খুঁজে পাওয়া গেল টিউব রেল কোম্পানির হারানো মালের আপিসে। সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণে তাঁর এই সময়কার মনের অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "অবশেষে আমি যখন সেখানে সেই হারানো জিনিসটি খুঁজে পেলাম তখন আমার মনে স্বস্তি যে অনুভব করলাম তা সহজেই অনুমান করা যায়। তার পর আমার অনেক সময় মনে হয়েছে আমার অবহেলার ফলে 'গীতাঞ্জলির' পাণ্ডুলিপি যদি হারিয়ে যেত, ঘটনার স্রোত না জানি কি রূপ ধারণ করত।"[১]

এটা সত্যই ভাববার প্রশ্ন ছিল বৈকি। তার ফল এমন হতে পারত যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় পশ্চিমের মানুষের কাছে অনাবিষ্কৃত রয়ে যেত, কিম্বা অন্তত তা দীর্ঘকাল বিলম্বিত হত। বিশ্বসংস্কৃতির স্বার্থের দিক হতে উভয় সম্ভাবনাই একান্ত অবাঞ্ছনীয় ছিল। সম্ভবত ইংরাজি গীতাঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের ভাবী জীবনের পথ নির্দ্ধারণে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা হয়ত করতে পারত না।

১ **On the Edges of Times, with Father in London**

এই ইংরাজি গীতাঞ্জলির সাহায্যে যে মানুষটি রবীন্দ্রনাথের সহিত পশ্চিমের সাহিত্যরসিকদের পরিচয় ঘটানোর প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন শিল্পী রদেনস্টাইন। সে বিষয় তাঁর প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও ছিল। দেশের অন্যতম বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তিনি বিলাতের বিদগ্ধ সমাজে একটি উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এদিকে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনুরাগ এবং ব্যুৎপত্তি থাকায় নানাক্ষেত্র হতে নানা .বিশিষ্ট মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। অতিথি আপ্যায়নেও তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। ফলে শিল্প, সাহিত্য ও রাজনীতির মহলের অনেক গুণী মানুষ ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিলাতের যে কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সঙ্গে কারও পরিচয় ঘটিয়ে দেবার তিনি ক্ষমতা রাখতেন। উভয়ের আলোচনার পর ঠিক হল যে ৭ই জুলাই ১৯১২ তারিখের সন্ধ্যায় রদেনস্টাইন-এর বাড়ীতে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের একটি সমাবেশের ব্যবস্থা হবে এবং সেখানে কবি ইয়েটস্ ইংরাজি গীতাঞ্জলি হতে কবিতা পাঠ করে তাঁদের শোনাবেন। সেই সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে হেনরী নেভিনসন, মার্কিন কবি এজরা পাউণ্ড. মে সিনক্লেয়ার ও এণ্ড্রুজ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই পাঠসভা অভাবনীয়ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। নির্বাচিত বিদগ্ধমণ্ডলী শুধু কবিতার পাঠ মনোযোগ সহকারে শোনেন নি গভীরভাবে মুগ্ধও হয়েছিলেন। তাঁরা তখনি রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

পরের দিন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বহন করে অনেক চিঠি তাঁর হাতে এসেছিল। এণ্ড্রুজ যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, শৈশবে শোনা মধুর ধ্বনির মত বারবার তাঁর স্মৃতিপথে উদিত হয়ে কবির ইংরাজি রচনার সুরমাধুর্য তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জয় করে নিয়েছে।[২] রবীন্দ্রনাথের কাব্যমাধুর্য তাঁকে এমনি মুগ্ধ করেছিল!

২ "It was the haunting melody of the English so simple, like the beautiful sounds of my childhood that carried me completely away."

রবীন্দ্রনাথের রচনার আত্মকৃত ইংরাজি অনুবাদ পড়ে ইতিপূর্বেই এণ্ড্রুজ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু রদেনস্টাইন-এর গৃহেই উভয়ের পরস্পরের সহিত প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। বলাবাহুল্য এই পরিচয় পরবর্তীকালে নিবিড় সৌহার্দ্যে পরিণতি লাভ করেছিল, কারণ তাঁরা ছিলেন সমধর্মী। এই বন্ধুতার স্বাকৃতি স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত ইংরাজি প্রবন্ধ গ্রন্থ 'সাধনা' এণ্ড্রুজ-এর নামে উৎসর্গ করেছিলেন।

প্রশ্ন ওঠে, রবান্দ্রনাথের এই কাবতাগুলির ইংরাজি অনুবাদের মধ্যে এমন কি জিনিস ছিল যা তাঁর পশ্চিমের শ্রোতাদের এমনভাবে মুগ্ধ করেছিল? এর উত্তর খুঁজতে হবে তাঁর শ্রোতাদের মন্তব্য হতেই, কারণ তাব মধ্যেই তাঁদের মানাসক প্রতিক্রিয়ার সন্ধান মিলবে।

রবীন্দ্রনাথকে অ৷ভনন্দন জানিয়ে এই বৈঠকের পর শ্রীমতী মে সিনক্লেয়ার যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, এই অনুবাদগুলির মধ্যে শুধু পরিপূর্ণ সৌন্দর্য এবং অনবদ্য কাব্য আত্মপ্রকাশ করে নি, তারা তাঁর কাছে সেই স্বর্গীয় বস্তুটি অনুভূতি হিসাবে স্থাপন করেছে যাকে তিনি বেদনাদায়ক অনিশ্চিয়তার পরিবেশে ক্ষণে ক্ষণে পেয়ে হারান।[৩]

তিনি অতিরিক্তভাবে আরও উল্লেখ করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি ভাষায় সেই সব জিনিস স্থাপন করেছেন যা ইংরাজি বা অন্য পাশ্চাত্য ভাষায় লিখিত হবে বলে আশা ছিল না।[৪]

কবি ইয়েটস গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখে দেবার ভার স্বহস্তে নিয়েছিলেন। ভূমিকায় তিনি যে প্রশস্তি রচনা করেছিলেন তা পড়ে মনে হয়, তার মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী বস্তুর একত্র সমাবেশ দেখেই

৩ "It is not only that they have an absolute beauty, a perfection as poetry, but they have made present for me for ever the divine thing that I can only find by flashes and with an agonising uncertainty."

৪ "He had put into English things it is despaired of ever seeing written in English at all or in any westein language."

তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঋষিসুলভ গুণে ভূষিত। এদিকে লক্ষ্য করা যাবে যে 'রেনেস াস'-এর পর ইয়োরোপের ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের রচনা সাহিত্যরসিকদের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করত না; কারণ তাঁদের কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতি অনুরাগ হেতু তাঁদের রচনায় যা কিছু সুন্দর তা বর্জিত হত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঋষির দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও সুন্দরকে বর্জন করেন নি। অন্তরে তিনি তপস্বী হয়েও তিনি জীবনকে ভালোবেসেছিলেন, প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। অতিরিক্তভাবে এটাও লক্ষ্য করবার যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত পশ্চিমের মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রীতি বাস্তব সত্যরূপে এই রচনাগুলির মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, এই রচনা ধর্মানুভূতিতে আরও গভীরতা ফুটিয়ে তুলে শিল্পীর আনন্দানুভূতির পর্যায়ে তাকে স্থাপিত করেছিল

আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে ইয়েটস-এর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এখানে স্থাপন করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "আমাদের জানা ছিল না যে ভগবানকে আমরা ভালোবাসি। এমনও হয়ত হতে পারে আমরা তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতাম না; তবু অতীত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, বনের পথে চলার সঙ্গে, পাহাড়ের বুকে অবস্থিত নির্জন স্থানের মাধুর্যের সঙ্গে, যে মেয়েদের ভালোবেসেছি তাদের সহিত যে রহস্যঘন সম্বন্ধ নিরর্থক ভাবে দাবী করেছি তার সঙ্গে যে মাধুর্য জড়িত তার মধ্যে প্রক্ষিপ্তভাবে এই অনুভূতিটিকে আবিষ্কার করি।"[৫]

এখানে মূল কবিতাগুলির অনুবাদ গদ্যে রচিত হয়েছে। কাজেই অনুবাদের মধ্যে মূল কবিতার ছন্দোমাধুর্য ধরা পড়ে নি। ফলে যে পাঠক অনুবাদ পড়বেন তাঁর কাছে মূল রচনার শব্দমাধুর্য[৬] অনাবিষ্কৃত রয়ে যাবে। তবু মনে হয় গদ্যে অনুবাদ করাই সংগত

৫ "The emotion that created this insidious sweetness."

৬ Euphony

হয়েছিল ; কারণ এগুলি গৌণ জিনিস। অপর পক্ষে গদ্য অনুবাদে মূলের ভাবগুলি এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে রূপ দেওয়ার কাজ অনেক সহজ হয়ে পড়ে। ছন্দের নিগড়ে তাকে বাঁধলে সেটা সম্ভব হত না। গদ্যে অনুবাদ বিশিষ্ট ইংরাজি-ভাষী সাহিত্যিক মহলে এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল দেখে মনে হয় এই গদ্য অনুবাদ সার্থক হয়েছিল।

এটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে এই বৈঠকে শ্রোতাদের মনে প্রথমত যা গভারভাবে রেখাপাত করেছিল তা হল অনুবাদের নিজস্ব সাহিত্যিক গুণ। দ্বিতীয় আকর্ষণের বস্তু হল শ্রীমতী সিনক্লেয়ার যেমন বলেছেন, পাশ্চমের মানুষের কাছে এগুলি একটি নূতন সাহিত্যিক বিষয়ের পরিচয় এনে দিয়েছিল। এর অভিনবত্ব এর একটা বড় আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তৃতীয়ত সব থেকে বড় কথা, এই কবিতাগুলির মধ্যে পশ্চিমের মানুষের কানে একটি হারানো সুর পুনরায় ধ্বনিত হয়েছিল। প্রযুক্তিবিদ্যাভিত্তিক বস্তু-তান্ত্রিক সংস্কৃতির পরিবেশে ঈশ্বরপ্রীতি বোধের শক্তি একরকম লোপ পেয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মত ভক্তের হৃদয় হতে মথিত এই মধুর অনুভূতিগুলি তাঁর রচনাশৈলীর গুণে অপূর্ব-মাধুর্য-মণ্ডিত হয়ে পশ্চিমের মানুষের কাছে নূতন করে তার আস্বাদ এনে দিয়েছিল। ধর্মানুভূতি এখানে সুচারু রসসাহিত্যের বেশে তাদের কিছু 'ব্রহ্মাস্বাদ' গ্রহণের সুযোগ এনে দিয়েছিল।

এর পর যা ঘটেছিল তা রীতিমত নাটকীয় ব্যাপার। যাঁরা ছিলেন শ্রোতা তাঁরা হয়ে দাঁড়ালেন রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। তিন দিন পরে তাঁরা ট্রোকাডেরো রেস্তোরাঁতে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করলেন। সেখানে কবি ইয়েটস তাঁকে স্থানীয় সাহিত্যরসিকদের সহিত পরিচয় করিয়ে দিলেন। এখানেও তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ অতিথিদের পড়ে শোনালেন এবং শেষে তার গুণগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করলেন। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা

যেতে পারে। তিনি সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি মূল ভাবধারা পরিস্ফুট; তা হল ঈশ্বরপ্রীতি।[৭] তিনি আরও বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, তাঁর কবিতায় লেখনীর মোহন স্পর্শে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও গভীর ঈশ্বরপ্রীতি পরিস্ফুট, তিনি ত মালা জপেন না, ফুল জপেন[৮] এই গ্রন্থে তাই অফুরন্ত সৌন্দর্যের প্রাচুর্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথকেও কিছু বলতে হয়েছিল। তাঁর সেই উক্তি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ; সুতরাং এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। তিনি বলেছিলেন ইংরাজিতে। তার বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া হল:

"প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকবে এবং পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যই থাকবে—ভগবান করুন তার অন্যথা যেন না হয়; কিন্তু শান্তির পরিবেশে পরস্পর মনের মিল রেখে প্রীতির সম্বন্ধে মিলতে হবে; তাদের ভিন্নতা হেতু সে মিলন আরও ফলপ্রসূ হবে; সমগ্র মানবজাতির বেদীমূলে পবিত্র বিবাহবন্ধনে সে মিলনের পরিণতি ঘটতে হবে।"

ট্রোকাডেরো রেস্তোরাঁয় এই অভ্যর্থনার পর তাঁর ভক্তমণ্ডলী ঠিক করলেন যে রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশের ভার তাঁরা নিজেরাই গ্রহণ করবেন। সুতরাং ইণ্ডিয়া সোসাইটির তত্ত্বাবধানে বেসরকারী ভাবে এই পুস্তকের প্রকাশনের ব্যবস্থা হল। স্বয়ং ইয়েটস ভূমিকা রচনার ভার নিলেন।

এই সময়ে যে কথাটি কবির মনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল তা হল বিশ্বের স্বার্থে পশ্চিমের এবং প্রাচ্যের সংস্কৃতির মিলনের প্রয়োজনীয়তা। একের বিজ্ঞাননিষ্ঠা ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের বাস্তব সম্পদ বৃদ্ধি করেছে; অপরপক্ষে অন্যের সাধনালব্ধ মানসিক সম্পদ

৭ "In all his poems there is one single theme, the love of God."

৮ "Tagore loves nature; his poems are full of the most beautiful touches showing his keen observation and deep love. He does not count beads but flowers."

সেই শক্তি ধারণ করে যা মানুষের মনে শান্তির বারি সিঞ্চন করতে পারে। পৃথিবীর মানুষের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিপূর্ণ জীবন গড়ে তুলতে উভয় ভাবধারার মিলনের প্রয়োজন। তারা 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' এই ছিল তাঁর অভিলাষ। তাঁর মনের এই ঐকান্তিক ইচ্ছা তাঁর উত্তর জীবনে হিবার্ট বক্তৃতা মালায় পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শধারা তাদের যুক্ত কলধ্বনির মধ্যে অন্তরের সঙ্গতি লাভ করে যখন সার্থকতামণ্ডিত হবে তখন তাঁর আনন্দের সীমা থাকবে না।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষেই ইণ্ডিয়া সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ইংরাজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হল। ফলে পশ্চিমের মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য আত্মপ্রকাশ করল। যে কাব্য ইংরাজি সাহিত্যরসিকের মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর হৃদয় জয় করে নিয়েছিল আর তার এক ব্যাপক ক্ষেত্রে বিজয় অভিযান শুরু হল। সমগ্র পশ্চিমের মানুষ তাঁর কবিতাকে ভালোবাসল। পরের বছর এই বইখানি বিচারকমণ্ডলীর হৃদয়কে আর একবার জয় করে নভেম্বর মাসে নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হল। ফলে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

এই ঘটনা তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। ঠিক বলতে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে এক নূতন ভূমিকা গ্রহণে উদ্যোগী করেছিল। তিনি একদিন ক্ষোভ করে বলেছিলেন,

"আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি,
সে মহা আনন্দ মন্ত্র, সে উদাত্ত বাণী
সঞ্জীবনী।"

১ "When the streams of ideals that flow from the East and from the West mingle their murmurs in some profound harmony of meaning, it delights my soul."—*The Religion of Man.*

আর কারও এই গুরুদায়িত্ব বহন করবার সম্ভাবনা নেই দেখে তিনি তখন নিজেই সে ভার গ্রহণ করবার নির্দেশ অন্তর হতে পেলেন। কারণ, দীর্ঘ জীবন সাধনার ফলে বিশ্ববাসীকে ভারতবাসীর হয়ে কথা বলবার অধিকার তিনি এখন অর্জন করলেন। বাঙালীর কণ্ঠ ভারতের হয়ে বিশ্বের হৃদয় জয় করেছে। নোবেল পুরস্কার তার স্বীকৃতি। আর ত এ দায়িত্ব এড়ানো যায় না। এখন হতে তাঁর জীবনের ব্রত হল ভারতের দূত হয়ে নানা দেশে ভ্রমণ করে দূরকে নিকট করবার, পরকে আপন করবার, বিশ্ববাসীর সহিত মিলন সেতু রচনা করবার এবং ভারতের বাণী শোনাবার। এই ভূমিকা দিয়েই তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায় রচিত। তা শুরু হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আমেরিকা যাত্রা দিয়ে এবং শেষ হয় '৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহল ভ্রমণ দিয়ে। তার পর বার্দ্ধক্যের ভারে শারীরিক অক্ষমতা হেতুই তাঁর দৌত্যের ভূমিকা তিনি ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

রবীন্দ্রনাথের নাটক

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আরম্ভেই একটি আভাস দেবার প্রয়োজন বোধ করি। প্রবন্ধের আকার বড় হবে না; সুতরাং তার অপ্রশস্ত বক্ষে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটক সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা দেবার মাত্র এখানে চেষ্টা করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র বা প্রধানত নাট্যকার হতেন, তা হলে এই আলোচনা সহজ হয়ে যেত। শেকসপীয়ার-এর নাটকগুলির শ্রেণীবিভাগে জটিলতা নেই। ট্র্যাজিডি ও কমিডি এই দুই মূল শ্রেণীতে তাদের ফেলে আলোচনা করা যায়। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিকে ঐতিহাসিক, সামাজিক বা পৌরাণিক শ্রেণীতে বিভাগ করে একটি আলোচনা করা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটকগুলির ওপর এই ধরনের সহজ শ্রেণীবিভাগ আরোপ করা সম্ভব নয়। নাটকের পরিণতির দিক হতে বা যেখান হতে উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। আবার নাটকে প্রযুক্ত রীতির ভিত্তিতে যেমন গদ্য কি পদ্যনাট্য বা গীতিনাট্য, এইভাবে এ সব নাটকগুলির শ্রেণীবিভাগ করা যায় না। মোট কথা কোন একটি বিশেষ নীতির প্রয়োগ এখানে সম্ভব নয়, করতে গেলে দেখা যাবে তাতে একাধিক বাধা এসে পড়ে। প্রথমত একই নীতি সকল নাটকের উপর প্রয়োগ করা যায় না; দ্বিতীয়ত নাটকগুলির রূপ এমন মিশ্র আকারের যে বিশেষ বিশেষ রীতির প্রয়োগেও সন্তোষজনক শ্রেণীবিভাগ সম্ভব হয় না।

তাঁর নাট্যে এই জটিলতার মূল কারণ তিনি শুধু শিল্পী ছিলেন না, একাধারে শিল্পী ও দার্শনিক ছিলেন। শুধু কি তাই? শিল্পী হিসাবেও তাঁর প্রতিভার বিকাশ বহু ও বিচিত্র ক্ষেত্রে। কথাশিল্প, কবিতা, সংগীত, নাট্য, নৃত্যশিল্প সবগুলিতেই তিনি অনন্যসাধারণ দক্ষতার

পরিচয় দিয়েছেন। অপরপক্ষে তাঁর গভীর মনীষা তাঁকে দর্শনে ও আধ্যাত্মিক সাধনায়ও আকৃষ্ট করেছে। বিশ্বরহস্য ভেদ করতে তিনি নানা দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন করেছেন। সাধনজীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি বিশ্বসত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে মনন এবং দিব্যদৃষ্টিতে লব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সূক্ষ্মদর্শী মন বিশ্বের মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যেখানে যে দোষের সন্ধান পেয়েছে, তার সমালোচনা করে তিনি নানা ভাষণে, চিঠিতে এবং প্রবন্ধে নানা মন্তব্য করেছেন। কাজেই তাঁর মন গতানুগতিক পথে কাজ করে নি। তাঁর মতি-গতি বহু ও বিচিত্র পথে প্রবাহিত। ফলে দেখা যায় নাটককে তিনি কেবল শিল্প হিসাবে ব্যবহার করেন নি। তার রীতি সম্বন্ধে যেমন একদিকে তাকে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তেমন অপরদিকে তাঁর সাধনালব্ধ এবং চিন্তালব্ধ তত্ত্বগুলির বাহন হিসাবেও তাকে ব্যবহার করেছেন। ফলে একই নাটকে এমন বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে যে কোন একটি নীতির ভিত্তিতে তাদের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়। একই কারণে একটি বিশেষ নাটককে কেবল একটি বিশেষ নীতির প্রয়োগে ব্যাখ্যা করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে দু একটি উদাহরণ স্থাপন করলে আমাদের প্রতিপাদ্যটি সহজবোধ্য হবে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটককে আমরা কাব্যনাট্য বলতে পারি, কমিডিও বলতে পারি আবার গীতিনাট্যও বলতে পারি। অনুরূপভাবে 'শ্যামা' নাটকখানিকে আমরা কাব্যনাট্যও বলতে পারি, গীতিনাট্যও বলতে পারি, আবার নৃত্যনাট্যও বলতে পারি। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, আমরা কোন নীতি প্রয়োগ করে তাদের শ্রেণীর নির্দেশ করব। মনে হয় এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথই অবলম্বন করতে পারি। 'বাল্মীকি প্রতিভা'কে তিনি গীতিনাট্য বলেছেন। আবার 'শ্যামা'কে তিনি নৃত্যনাট্য বলেছেন। বোঝা যায় যে এসব ক্ষেত্রে একাধিক বৈশিষ্ট্য

লক্ষিত হলেও যেটি মূল বৈশিষ্ট্য তার ভিত্তিতেই তাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। প্রথমটির মূল বৈশিষ্ট্য তার গীতিরূপ, দ্বিতীয়টির মূল বৈশিষ্ট্য তার নৃত্যরূপ।

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের নাট্যের সামগ্রিক আলোচনায় আমরাও এই পথ অবলম্বন করতে পারি। এই নীতিপ্রয়োগের ফলে তাঁর নাটকগুলিকে নিম্নলিখিত ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

(১) গীতিনাট্য	(২) কমিডি
(৩) ট্র্যাজিডি	(৪) ঋতুনাট্য
(৪) প্রতীক নাট্য	(৬) নৃত্য নাট্য

এই বিভাগের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির একটি সাধারণ আলোচনা এখানে করা হবে।

১ গীতিনাট্য

এই শ্রেণীতে তাঁর প্রথম জীবনে রচিত নাটকগুলি পড়ে যায় বলে এদের দিয়ে আলোচনা শুরু করা অযৌক্তিক হবে না। এই শ্রেণীতে পড়ে 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'রুদ্রচণ্ড', 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা'। প্রথম তুটি রচিত হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয়টি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষেরটি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্য বিলাতে প্রবাসের পর দেশে ফিরেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতে তাঁর অধিকার পূর্বেই স্থাপিত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের সহিত পরিচয়লাভ নূতন ঘটেছে। সম্ভবত পশ্চিমের অপেরা-জাতীয় নাটকের সহিতও তিনি বিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন। ফলে দেশে ফিরে এসে তাঁর এক অদম্য ইচ্ছা হয়েছিল পরীক্ষামূলকভাবে তিনি সঙ্গীতে নাটক রচনা করে মঞ্চস্থ করবেন। সেই চেষ্টার প্রথম ফল 'বাল্মীকি প্রতিভা'। নাটকখানি রচিত হবার পর তাঁর পৈত্রিক গৃহে মঞ্চস্থও হয়েছিল। অনেক বিশিষ্ট মানুষ তা দেখে খুসী হয়েছিলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে কবিতায় এক প্রশস্তি রচনা করে রবীন্দ্রনাথকে নববাল্মীকি বলে অভিবাদন জানিয়েছিলেন।

তাঁর এই পরীক্ষার সাফল্যে রবীন্দ্রনাথ কতখানি তৃপ্তি পেয়েছিলেন তা তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে' উল্লেখ আছে। প্রায় একই সময়ে রচিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'কড়ি ও কোমলে' নূতন কাব্যরীতির প্রয়োগ যে প্রতিকূল সমালোচনা আকর্ষণ করেছিল অথচ নাট্যের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল তার তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, "আমার অনেক মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠক সমাজকে বারম্বার উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতিনাট্যে ('বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কাল মৃগয়া') যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোন ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন।" বাংলা নাটকে গীতিরূপের আরোপ এইভাবে প্রথম ঘটেছিল। এই শ্রেণীর নাটককে তিনি পাশ্চাত্য অপেরা শ্রেণীর নাটক থেকে পৃথক করতে চেয়েছেন; কারণ অপেরায় তাঁর মতে সংগীতের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কিন্তু সংগীতকে তিনি নিজের রচিত নাটকে অভিনয়ের অনুগামী রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

২ কমিডি

কমিডি বা যাদের হাল্কা নাটক বলি তাদের মধ্যে বিপরীত ধর্মের সমাবেশ দেখি। তার কারণ কমিডি ও ট্র্যাজিডি কথা দুটি বিদেশ হতে আমদানী; মূলে তারা বিপরীত-ধর্মীরূপে চিহ্নিত ছিল। ট্র্যাজিডি বললে বুঝতাম তাতে মহৎ চরিত্রের নায়ক থাকবে বীরত্ব ব্যঞ্জক ঘটনা থাকবে এবং শেষে মৃত্যু ঘটবে। কমিডি মানে বুঝতাম তাতে হাল্কা সুর থাকবে এবং কৌতুক থাকবে তবে স্থূলরস বর্জিত হবে। স্থূলরসের প্রাধান্য থাকলে তাদের 'ফার্স' বলা হত। এখন ঠিক এই নির্দেশগুলি যথাযথ পালিত হয় না। যাকে কমিডি বলি তাতে মহৎ চরিত্রও পাই। যাকে ট্র্যাজিডি বলে তাতে বীররস বর্জিত হয়েও বিয়োগান্ত পরিণতি হতে পারে। কমিডি অর্থে বিয়োগান্ত নয় ধরতে পারি এবং ট্র্যাজিডি

অর্থে বিয়োগান্ত ধরতে পারি। শ্রেণীবিভাগে সামগ্রিক ব্যাপ্তি সূচিত করতে এই অর্থকে গ্রহণ করতে পারি। ফলে কমিডি দুই ধরনের হতে পারে। এক ধরনের হতে পারে যেখানে হাল্কা পরিবেশ পরিস্ফুট না হলেও মিলনান্তক। আবার এক ধরনের হতে পারে যেখানে হাল্কা পরিবেশ পরিস্ফুট হয়ে ব্যঙ্গরসাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। স্থূল ব্যঙ্গরসাত্মক নাটকই ফার্স।

রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকগুলির মধ্যে যেমন ব্যঙ্গঘেঁষা নাটক পাই তেমন মার্জিত রুচির কমিডিও পাই। প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ পাই 'বশীকরণে' বা 'গোড়ায় গলদে।' উভয়ক্ষেত্রেই ভ্রান্তিকে ভিত্তি করে প্রহসনের অবতারণা করা হয়েছে। শেকসপীয়ার-এর 'কমিডি অব এরারস' বা 'মিডসামার নাইট্‌স ড্রীম'-এর সঙ্গে এদের তুলনা চলে। অপরপক্ষে 'চিরকুমার সভা' ততখানি প্রহসনঘেঁষা নয়। এখানে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচায়ক বাক্যালাপের সাহায্যেই কৌতুক সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকের মধ্যে যে শ্রেণীর কমিডি ব্যঙ্গরস প্রধান নয় সেই শ্রেণীর নাটক দুর্ভাগ্যক্রমে খুঁজে পাওয়া যায় না। 'বাঁশরী' বা 'নলিনী'কে কমিডি বলা যায় কিনা সন্দেহ। 'বাঁশরী'তে দেখি সোমশংকর সুষমাকে বিবাহ করলেও তার মন পড়ে রইল বাঁশরীর কাছে। অনুরূপভাবে দেখি 'নলিনীতে' নীরদের নলিনীর সঙ্গে মিলিত হবার পরিণতি নীরজার মৃত্যু। উভয়ক্ষেত্রেই বিয়োগ এবং মিলন যেন মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে।

৩ ট্রাজিডি

এই শ্রেণীতে পড়ে 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'মালিনী', 'তপতী' ও 'প্রায়শ্চিত্ত'। প্রথম তিনখানি নাটক পদ্যে রচিত এবং শেষের দুখানি গদ্যে রচিত। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাট্য তাঁর প্রথম জীবনে রচিত 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ। অনুরূপভাবে 'বিসর্জন' তাঁর রচিত উপন্যাস 'রাজর্ষির' নাট্যরূপ। 'রাজা ও রাণী' সোজাসুজি নাট্য

হিসাবেই রচিত। 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জন' দুখানি গ্রন্থই উচ্চশ্রেণীর নাটক। তবে তুলনায় 'রাজা ও রাণীর' বিন্যাসে যে কিছু দুর্বলতা রয়ে গেছে তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন 'লিরিকের প্রাবল্যে নাটক হয়েছে কাব্যের জলাভূমি ; তার টানে প্রবেশ করেছে ইলা ও কুমারের উপসর্গ।' 'তপতীতে' সেই দোষ খণ্ডনের চেষ্টা হয়েছে। তুলনায় 'বিসর্জন' আরও সুসন্নিবদ্ধ এবং তাই তা আমাদের আরও বেশী মুগ্ধ করে। 'বিসর্জনকে' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে অনায়াসে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

৪ ঋতুনাট্য

ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার প্রভাব বিলক্ষণ বর্তমান। ঠিক বলতে কি বিশ্বসত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর যে চিন্তা তা এখানে নাটকের মধ্য দিয়ে প্রচার করা হয়েছে। সে চিন্তা প্রধানত গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতার মধ্যে। এই দার্শনিক তত্ত্বটির সঙ্গে কাজেই আমাদের প্রথমে পরিচিত হবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বিশ্বসত্তার একটি রূপ রবীন্দ্রনাথের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। সেটি হল তাঁর নিত্যচঞ্চল রূপ। তাঁর এই গতিশীলতার সঙ্গে নদীর প্রবাহের ঠিক তুলনা হয় না, কারণ সে প্রবাহে ছন্দ নেই। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় সৃষ্টিপ্রবাহ শুধু নিত্য গতিশীল নয়, তার মধ্যে ছন্দ আছে। সেই ছন্দকে সূচিত করে জন্ম-মৃত্যু, ভাঙা-গড়া, যৌবন-জরা। তাই দেখি 'বলাকার' 'চঞ্চলা' কবিতায় সৃষ্টির প্রবাহকে নদীর প্রবাহের সহিত তুলনা দিয়ে আরম্ভ করলেও শেষে সৃষ্টিপ্রবাহের গতিশীলতার মধ্যে ছন্দকে সূচিত করতে তিনি তাকে নৃত্যপরা অপ্সরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

ওগো নটী চঞ্চলা অপ্সরী অলক্ষ্য সুন্দরী
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
বিশ্বের জীবন।

এই নৃত্যপরা অপ্সরী 'মহুয়ার' বোধন কবিতায় 'নিত্যকালের মায়াবী' রূপে বর্ণিত হয়েছেন। তাঁরও কাজ 'ভরা পাত্রকে শূন্য করা', 'মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছিয়ে চির পুরাতনকে উজ্জ্বল করে তোলা'। এই পরিকল্পনার পরিপূর্ণ রূপটি পাই তাঁর কল্পিত নটরাজের চিত্রে; তাঁর নৃত্যের তালে বিশ্ব ভাঙ্গে, বিশ্ব গড়ে, তাঁর আনন্দ-নৃত্যের স্পর্শ লেগে 'ছয় ঋতু নৃত্যে মাতে' এবং 'ধরাতে বর্ণ, গীত ও গন্ধের প্লাবন বহে যায়।'

এই শ্রেণীতে পড়ে 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী', 'শ্রাবণগাথা', 'বসন্ত', 'ঋতুরঙ্গ' ও 'শেষবর্ষণ'। এই নাটকগুলিতে যে সুরটি বার বার ধ্বনিত হয়েছে তা হল 'যিনি নিত্যকালের মায়াবী' তিনি 'ভরা পাত্রটি শূন্য করেন ভরিতে নূতন বারি।' 'বসন্ত' নাটকে দেখি ঋতুরাজ পূর্ণ হতে রিক্তে এবং রিক্ত হতে পূর্ণের মধ্যে যাতায়াত করেন। 'শ্রাবণগাথায়' দেখি শ্রাবণের ভিতর দিয়ে গ্রীষ্মের রিক্ততার তপস্যা শরতে পূর্ণতা পেল। ছয়টি ঋতু যেন ভাঙা গড়ার ছন্দে একই সূত্রে গ্রথিত, তারা যেন একই নটরাজের নৃত্যের ছন্দের তাল রক্ষা করে। ঋতুরঙ্গে এই রূপ বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

এই প্রসঙ্গে শেলীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করা যেতে পারে। তাঁর 'ওয়েস্ট উইণ্ড' সম্পর্কিত কবিতার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। সেখানে শীতের প্রতীক পশ্চিমের ঝড় এবং বসন্ত পৃথক সত্তা। একজন ভাই, অপরজন ভগিনী। শীত ঝড় তুলে গাছের পাতা খসিয়ে প্রকৃতিকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তাই তাকে তিনি বর্ণনা করেছেন একাধারে 'ধ্বংসকারী এবং সংরক্ষক' বলে।[১] পরে বসন্ত শিঙা বাজিয়ে তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। সুতরাং শেলীর পরিকল্পনায় ঋতুগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় তারা পরস্পর সংযুক্ত। তারা একই নটরাজের নৃত্যের ছন্দের তাল রক্ষা করতে তাঁর সঙ্গে নৃত্যে মাতে।

১ "Destroyer and preserver, hear oh hear."

৫ প্রতীকধর্মী নাটক

এই শ্রেণীতে পড়ে 'প্রকৃতির পরিশোধ', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'রাজা', 'অরূপরতন', 'ডাকঘর' প্রভৃতি। রবীন্দ্র-নাট্যের বিশিষ্ট সমালোচকগণ এদের নানাভাবে নামকরণ করেছেন। কেউ রূপক নাটক নাম দিয়েছেন, কেউ সাংকেতিক নাটক বলেছেন, কেউ-বা এই তুটি শব্দকে ভিন্ন অর্থে ধরে কোনটিকে রূপকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কোনটিকে-বা সাংকেতিক শ্রেণীতে ফেলেছেন।

এই সকল নাটকেরই মূল লক্ষণ হল এখানে প্রতীককে অবলম্বন করে নাটককে পরিস্ফুট করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় কোথাও প্রচলিত সমাজবিন্যাসের সমালোচনা করে তার ত্রুটি কোথায় তা দেখানো হয়েছে। কোথাও কবির নিজ সাধনজীবনে লব্ধ উপলব্ধিকে পরিস্ফুট করবার চেষ্টা হয়েছে। প্রথমটির উদাহরণ হিসাবে আমরা 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'র উল্লেখ করতে পারি। 'অচলায়তনে' ভারতের রক্ষণশীল সমাজের অন্ধ সংস্কারের মুগ্ধ আনুগত্য যে সমাজকে নির্জীব করে তোলে তাই হল প্রতিপাদ্য। 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবীতে' পাই পশ্চিমের প্রযুক্তি বিদ্যাকে ভিত্তি করে যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত ও লোভপ্রণোদিত আনন্দের লেশ রহিত জীবনের তীব্র সমালোচনা এই সমালোচনা তিনি পশ্চিমে ভ্রমণকালে নানা ভাষণে, ভ্রমণ কাহিনীতে এমন কি তাঁর হিবার্ট বক্তৃতা-মালায়ও নানা প্রসঙ্গে করেছেন। পাশ্চাত্ত্য সমাজে যন্ত্র যে মানুষকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে, তার জীবনের মুক্ত ছন্দকে ব্যাহত করছে এবং বস্তুপিণ্ডের লোভ যে মানুষকে সহজ স্বাভাবিক জীবন হতে দূরে টেনে নিয়ে তাকে কারাগারে আবদ্ধ করেছে, এটি হৃদয়ঙ্গম করে তিনি শুধু বেদনা পান নি, ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যন্ত্রের যে প্রয়োজন নেই তিনি তা বলেন না, তবে যখন জীবনকে সংকুচিত করে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করে, প্রাণের ধারাকে ব্যাহত করে, তখন তিনি তাকে সমর্থন করতে প্রস্তুত নন।

এই প্রসঙ্গে তিনি একটি উপমা প্রয়োগ করেছেন। পাখীর মুক্ত গগনে বিচরণের জন্মগত অধিকার আছে। কিন্তু সেই অধিকারের সার্থক ব্যবহারের জন্য তার একটি নীড়ের প্রয়োজন। সেই নীড়ের পরিবর্তে যদি তাকে সোনার খাঁচা দেওয়া হয়, তা হলে তার বাস্তব সম্পদ বাড়ে, কিন্তু তাকে মুক্তজীবনের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত করা হয়। 'মুক্তধারায়' যন্ত্রের জীবনধারাকে ব্যাহত করবার শক্তির বীভৎসতা মূল বর্ণনীয় বিষয়। 'রক্তকরবীতে' পাই প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগে সঞ্জাত অন্ধ সম্পদ-লোলুপতা, পৃথিবীর কোলে মুক্তজীবন হ'তে বিচ্ছিন্ন করে মানুষকে যে আনন্দহীন কারাগারে আবদ্ধ করে তার বর্ণনা। উভয়েই প্রযুক্তি বিদ্যাভিত্তিক পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির দুর্বলতার ভিন্ন আকারে প্রতিবাদ।

রবীন্দ্রনাথের সাধনজীবনে লব্ধ উপলব্ধির ব্যাখ্যা হিসাবে আমরা 'রাজা' ও 'অরূপরতনের' কথা উল্লেখ করতে পারি। তাঁর ধারণায় বিশ্বসত্তার প্রকাশ দুটি ভিন্ন পর্যায়ে ঘটে থাকে। প্রথমটিকে তিনি কাজের প্রকাশ বলেছেন। সেখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক শক্তির মত কাজ করেন। দ্বিতীয়টিকে তিনি আনন্দের প্রকাশ বলেছেন। সেখানে বিশ্বসত্তা ব্যক্তিরূপী সত্তা হিসাবে কবির সঙ্গে প্রীতির আদান-প্রদান করতে উৎসুক। সেখানে তিনি বলপ্রয়োগ করেন না, সেখানে তিনি বলেন 'আমার আনন্দ তোমায় দিচ্ছি, তোমার আনন্দ আমায় দাও।'[২] ভক্ত যদি তাঁকে নিজের অন্তরে স্থান দেন তা হলে পরস্পরের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে; তিনি তখন কবির জীবনশিল্পী হয়ে তাঁর জীবনকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করেন। 'আত্মপরিচয়ে' তিনি প্রথম রূপটিকে বিশ্বদেবতা বলেছেন এবং দ্বিতীয় রূপটিকে জীবনদেবতা বলেছেন। অন্তরে তিনি অরূপ থেকেও অধিষ্ঠান নেন বলে তাঁকে অন্তরতমও বলেছেন। এই দুই নাটকে সেই তত্ত্ব পরিস্ফুট করবার চেষ্টা হয়েছে। ভক্তের অন্তরে

২ শান্তিনিকেতন। সৌন্দর্য

নিভৃতে মিলন হয় বলে তিনি 'অন্ধকার ঘরের রাজা' এবং 'অরূপরতন'। এই ভাবেই যিনি অসীম তিনি সীমার মাঝে প্রকট হন।

উভয় শ্রেণীর নাটকেই সমালোচনামূলক মন্তব্য বা সাধনজীবনে লব্ধ সূক্ষ্ম তত্ত্ব নানা প্রতীকের সাহায্যে পরিস্ফুট করার চেষ্টা হয়েছে। 'মুক্তধারায়' যন্ত্র প্রতীক, নদী প্রতীক, কারণ তা প্রাণের প্রবাহকে সূচিত করে। 'রক্তকরবীতে' নন্দিনী প্রতীক, কারণ তার প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। রক্ত-করবী প্রতীক, তা প্রাণশক্তির আত্মবিকাশের অদম্য ক্ষমতাকে সূচিত করে। 'অচলায়তনে' অচলায়তনও প্রতীক, কারণ তা রক্ষণশীলতার চাঞ্চল্যহীন স্থিরতাকে সূচিত করে। অনুরূপভাবে 'রাজা' বা 'অরূপরতনে' রাজা প্রতীক, তিনি জীবনদেবতাকে সূচিত করেন। সুদর্শনাও প্রতীক, তিনি ভক্তকে সূচিত করেন। প্রতীকের ব্যবহারই এই সব নাটকের সাধারণ লক্ষণ। সুতরাং এই শ্রেণীর নাটকগুলিকে প্রতীকধর্মী নাটক বলাই সংগত মনে হয়।

এই শ্রেণীর নাটকের বিভিন্ন আলোচনায় তাদের সূচিত করতে দুটি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। কোন সমালোচক তাকে রূপক-শ্রেণীর নাটক বলেছেন, কোন সমালোচক রূপকের সঙ্গে সাংকেতিক নাটকের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে, কোনটিকে রূপক শ্রেণীতে ফেলেছেন, কোনটিকে সাংকেতিক শ্রেণীতে ফেলেছেন, কোনটিকে মিশ্রশ্রেণীর বলে চিহ্নিত করেছেন। মনে হয় এই বিতর্কের প্রেরণা কবি-সাহিত্যসমালোচক ইয়েটস-এর 'সিম্বল' ও 'এলিগরি'-এর সূক্ষ্ম-পার্থক্য-সূচক বিশ্লেষণ হতে এসেছে। প্রথমটি সূচিত করতে সাংকেতিক শব্দটির ব্যবহার হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি সূচিত করতে রূপক কথাটির প্রয়োগ হয়েছে। কিন্তু 'এলিগরি-এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই ; তাতে একের নামে অন্যের কাহিনী বলা হয়ে থাকে। রূপক একটি অলংকার ; তা কাহিনী সূচিত করে না। ইয়েটস'র মতে যা 'সিম্বলিক' তা ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম তত্ত্বের প্রকাশনে সাহায্য করে। আর যা 'এলিগরি' তা ইন্দ্রিয়াতীত

নয় এমন বস্তু বা কোন পরিচিত তত্ত্বের প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করে এবং তাঁর মতে তা অন্যভাবে প্রকাশ করাও সম্ভব।[৩]

এঁদের ব্যবহৃত পরিভাষা মেনে নিলেও কোনটি সাংকেতিক আর কোনটি রূপক তা নির্ভর করে আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃতির ওপর। উপরের নীতি অনুসারে 'অচলায়তন' বা 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবীকে' রূপক বলতে হয়, কারণ তারা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের ব্যাখ্যা করে না। এবং তাদের যা প্রতিপাদ্য তা অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যেত। অপর পক্ষে 'রাজা' ও 'অরূপরতনকে' সাংকেতিক পর্যায়ে ফেলা যায় কারণ এখানে এক ইন্দ্রিয়াতীত সাধনলব্ধ তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অন্যভাবে ব্যাখ্যা তাদের সম্ভব নয় এই নাটকগুলিকে বিষয়বস্তুর প্রকৃতির ভিত্তিতে হয় ত তত্ত্ববাহী বলা যেত; কিন্তু মনে হয় তা ঠিক হবে না। কারণ এদের সবগুলি তত্ত্ববাহী নয়। এই প্রসঙ্গে 'ডাকঘর' নাটিকাটির উল্লেখ করা যেতে পারে।এটি একটি অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক সৃষ্টি ; নাটকের রূপ গ্রহণ করলেও এটি ঠিক নাটক নয়, কারণ এতে কাহিনী নেই, এর মধ্যে গতি নেই। কবির মনের একটি আকূতি, সুদূরকে পাবার ব্যাকুলতা এখানে সুন্দর রূপ পেয়েছে। কবিতার মধ্যে এর প্রকাশ প্রশস্ত, নাটক এর স্বাভাবিক রূপ নয়। এটিকে তত্ত্ববাহীও বলা যায় না। সুতরাং এই নাটকগুলির যা সাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্রতীকের সাহায্যে প্রতিপাদ্যের বা তত্ত্বের পরিস্ফুরণ তার দ্বারাই তাদের চিহ্নিত করা সুসঙ্গত। যাকে সাংকেতিক বলি তার ওপর অন্যের ধর্ম আরোপিত হয় না। তবু তা সংকেতে একটি নিগূঢ় তত্ত্বের পরিচয় দেয়। 'অরূপরতনে' রাজা সত্যই রাজা, কিন্তু তিনি ইঙ্গিতে জীবনদেবতার প্রতীক। যা রূপক তাতে উপমেয়ের ওপর অন্যের ধর্ম আরোপিত

৩ "A symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame, wh'le allegoery is one of many possible representations of an embodied thing an familiar principle". *Ideas of Good and Evil*, p. 123.

হয়। 'তাসের দেশে'র চরিত্রগুলির ওপর তাসের ছকে বাঁধা ভূমিকা আরোপিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলি প্রতীকধর্মী। কাজেই তাদের প্রতীকধর্মী বললে বিষয়টি আরও সরল হয়। তাদের তাই প্রতীকধর্মী বলাই সঙ্গত।

৬ নৃত্যনাট্য

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি অনন্যসাধারণ। এদের সমস্থানীয় নাটক বিশ্বের অন্য সাহিত্যে আছে বলে আমার জানা নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথের মত শিল্পীর পক্ষেই তাদের রচনা করা সম্ভব। যিনি একাধারে নাট্যকার, কবি, সুরকার এবং নৃত্যশিল্পী তাঁর পক্ষেই এই শ্রেণীর নাট্য রচনা সম্ভব। এই পর্যায়ে পড়ে 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', ও 'চণ্ডালিকা'।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল নৃত্যকে অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে অভিনয়ের মধুরতম রূপটি গড়ে তোলা। ভরতমুনি অভিনয়ের চারটি অঙ্গের কথা বলেছেন—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্বিক। তাদের মধ্যে শেষের দুটি গৌণ ও প্রথম দুটি মুখ্য অঙ্গ। আহার্য অর্থাৎ সাজসজ্জা বা রঙ্গমঞ্চ সজ্জা বা আলোকপাত —এগুলি বহিরঙ্গ। অল্প হলেও চলে বেশী হলেও চলে, একেবারে না হলেও যে চলে না তাও নয়। তাতেই বোঝা যায় যে এটি গৌণ অঙ্গ। সাত্বিক অভিনয় অন্তরের ভাবকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করে, যেমন স্বেদ, অশ্রুনিষেক, রোমাঞ্চ ইত্যাদি। এদের আঙ্গিক অংশ বলেও বর্ণনা করা যায়। কারণ এরা দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন শ্রেণীর অভিনয়ে অভিনয়ের সবগুলি অঙ্গেরই প্রয়োগ অল্পবিস্তর এসে পড়ে। তবে যার আধিক্য বেশী তার দ্বারাই অনেক সময় এই নীতির ভিত্তিতে অভিনয়ের শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। নৃত্যকে আমরা আঙ্গিক অভিনয় বলতে পারি, কারণ এখানে অঙ্গভঙ্গিই ভাব প্রকাশের প্রধান অবলম্বন। সাধারণ অভিনয়কে আমরা বাচনিক অভিনয় বলতে পারি। এই শ্রেণীর নাট্যে গদ্যভাষা প্রয়োগ হতে পারে,

ছন্দোবদ্ধ ভাষা প্রয়োগ হতে পারে যেমন শেকসপীয়ারের নাটকে, আবার সঙ্গীতে হতে পারে যেমন অপেরায় বা রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যে। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে আঙ্গিক ও বাচনিক অভিনয়ের মধুরতম রূপের সংযোগ ঘটানো। আঙ্গিক অভিনয়ের পরিপূর্ণতম রূপটি প্রকট হয় নৃত্যে, আর বাচনিক অভিনয়ের সব থেকে আকর্ষণীয় রূপটি পাই সঙ্গীতে। তিনি এই দুটি অঙ্গকে যুগ্মাশ্বের মত তাঁর অভিনয়ের রথটিকে পরিচালিত করবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। সুতরাং তাঁর এই শ্রেণীর নাটক শুধু গীতিনাট্য নয় বা শুধু নৃত্যনাট্য নয়, তা একাধারে সঙ্গীত ও দেহভঙ্গির নাটক। বলা যায় এইভাবে তিনি পাশ্চাত্ত্যদেশের ব্যালে ও অপেরার সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

ব্যালে নৃত্য অভিনয়ের বাহন হবার ক্ষমতা রাখে সত্য, কিন্তু তার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। তা গড়ে উঠেছে যন্ত্রসঙ্গীত, সজ্জা, দৃশ্য ও নৃত্যের সমন্বয়ে। তা কাহিনী বলবার এবং আবেগের অভিব্যক্তি দেবার ক্ষমতা রাখে; কিন্তু যেহেতু তার বাচনিক অঙ্গ নেই, সেই হেতু খানিকটা তা পঙ্গু। এই কারণে তা কাহিনী বলতে পারে, কিন্তু জটিল কাহিনী বলবার ক্ষমতা রাখে না। অনুরূপভাবে তা ভাব প্রকাশের ক্ষমতা রাখে, কিন্তু গভীর বা সূক্ষ্ম ভাব তার নাগালের বাহিরে। এইখানেই তার দুর্বলতা। অপরপক্ষে সঙ্গীতের ক্ষমতারও সীমা আছে। তা যে বাচনিক অভিনয়ের চরম রূপ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন জিনিসও আছে যা দেহভঙ্গির ভাষায় আরও সহজে ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়। যেখানে ভাষা দুর্বল সেখানে তা আরও ভাল কাজ করে। সুতরাং নৃত্য এবং সঙ্গীত খানিকটা উভয়ের পরিপূরক। ভাষা ও সুর যেখানে হার মানে, সেখানে দেহভঙ্গি পরিপূরক হিসাবে কাজ করে, আবার দেহভঙ্গি যেখানে হার মানে সেখানে সঙ্গীত সে অভাব পূরণ করে। দু একটি উদাহরণ স্থাপন করা যাক। কারও প্রতি মমতাবোধ প্রকাশ করতে দেহভঙ্গির ভাষা মনে হয় অপটু।

"তুমি আমার নয়নের মণি' বললে যা বলা হয়, দেহভঙ্গির সাহায্যে তাকে ভালো করে বলা যায় না। অনুরূপভাবে চরম হতাশা সূচিত করতে মুখেরভাষা ঠিক পারে না, দেহভঙ্গি আরও ভালো পারে। তা বোঝাতে মুখে 'হায় ভগবান' বলতে যা বোঝাবে, আকাশের দিকে হাত তুলে কপালে আঘাত হানলে আরও ভালো বোঝাবে। সুতরাং ভাষা ও সুরের সঙ্গে দেহভঙ্গির মিলন ঘটিয়ে সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আমরা অভিনয়ের পূর্ণতম রূপটি পেতে পারি। এই ধরনের চিন্তাধারাই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে নৃত্যনাট্য প্রবর্তনে উৎসাহিত করেছিল।

অভিনয়ের যেখানে নৃত্য এবং সঙ্গীত মূল বাহন সেখানে ভাষার অকারণ বাহুল্য বর্জনীয়। সেইজন্য দেখি, কাহিনী এখানে যতখানি সম্ভব ছোট করা হয়েছে, কারণ নৃত্য বচনের পরিপূরক হওয়ায় সঙ্গীতের ও অকারণ স্ফীতির প্রয়োজন থাকবে না। ফলে নাটক এখানে সুসন্নিবদ্ধ ও সুসংহত হয়েছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় এই শ্রেণীর নাটকগুলির বুনানি বেশ ঠাসা এবং বাঁধন আঁট-সাঁট। ফলে সাহিত্য হিসাবেও নাটকগুলির উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এই প্রতিপাদ্য বোঝা সহজ হবে যদি 'চিত্রাঙ্গদার' কাব্যনাট্য রূপের সহিত তার নৃত্যনাট্য রূপেব তুলনা করি। সাধারণভাবে বলা যায় তার কাব্য-নাট্য রূপ অতি মাত্রায় লিরিক-ধর্মী হওয়ায় তা যত সুখপাঠ্য তত অভিনয়ের উপযুক্ত নয়। তাই তাকে অভিনীত হতে বড় একটা দেখি না। অপরপক্ষে তার নৃত্যনাট্যরূপ বচনের বাহুল্য ত্যাগ করে যেন অভিনয়ের একান্ত উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছে। এই সম্পর্কে একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই আমাদের প্রতিপাদ্য বোঝা সহজ হবে। কাব্যনাট্যে অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার মিলনের দৃশ্যটি বেশ বড় এবং উচ্ছ্বাসপূর্ণ। নৃত্যনাট্যে তা প্রায় বর্জিত হয়েছে এবং মিলনের আনন্দসূচক একটি সঙ্গীতসহ নৃত্যের মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটেছে।